বাংলাদেশের মরমী সাহিত্য

জাহান-আরা বেগম

বাংলাদেশের মরমী সাহিত্য

জাহানআরা বেগম

ঢা

বাংলা একাডেমী ঃ ঢাকা

বা. এ. ৭১৬

প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ, ১৩৮৩
[এপ্রিল, ১৯৭৬]

প্রকাশক
ফজলে রাব্বি,
পরিচালক, প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রণে
আঞ্জুমান প্রিন্টিং প্রেস,
৩২, যুগীনগর লেন, ঢাকা

মূল্য : ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র

BANGLADESHER MARAMI SHAHITAYA : Mystic Literature of Bangladesh, by Jahanara Begum. Published by Bangla Academy, Dacca, Bangladesh. 1976.

Price : 6·50

আবদুল করিম ভুঁইয়া
ও
মরহুম আবদুল কুদ্দুস ভুঁইয়াকে
পরম শ্রদ্ধায়

সূচীপত্র

১। বাঙালী-মানস-বৈশিষ্ট্য ও মরমীবাদ ১
২। বাংলা মরমী সাহিত্যের উৎস ৭
৩। মরমীয়া ধারায় নাথ সাহিত্য ১৩
৪। বৈষ্ণব কবিতার মরমী রূপ ১৫
৫। মধ্যযুগের মুসলিম কবি-মানস ও সূফী প্রভাব ... ৩১
৬। বাউল, মারফতী, মুর্শিদী : মরমী সাহিত্যের মণিমুক্তা ... ৪০
৭। মরমী কবি রবীন্দ্রনাথ ৯০
৮। মরমী সাহিত্য : সীমাহীন বিরহের গান ... ৯৪
৯। শেষ কথা ৯৫

॥ ১ ॥

বাঙালী-মানস-বৈশিষ্ট্য ও মরমীবাদ

বাংলাদেশের ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য সুগভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এর একদিকে ছোট বড় পর্বতশ্রেণী, অন্যদিকে সুবিশাল সমুদ্র। মাঝে মাঝে সবুজ সমতল ভূমি। দেশের অভ্যন্তরে মালার মত ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য নদ নদী, খাল-বিল আর হাওর-বাওর। এইসব নদী দ্বারা বাহিত পলিমাটির আর্দ্র কোমলতা মানুষের মনকেও গ্রাস করেছে। তাই দেখা যায় বাঙালী সহজে যেমন অপরকে হৃদয়ে মিশিয়ে নেয় তেমনি নিজের স্নেহরসে অপরকে সিঞ্চিত করতেও তার সময় লাগে না। হৃদয়ে হৃদয়ে সংযোগ সাধনের এই যে নৈপুণ্য—এই নৈপুণ্যই বাঙালীকে বিশ্বের দরবারে একটি বিশিষ্ট আসন দান করেছে। বাঙালী তার আপন সংস্কৃতির দ্বারা চিহ্নিত। এই সংস্কৃতি সার্বজনীন সংস্কৃতি। নিজের শ্রমলব্ধ অন্ন দ্বারা ক্ষুধিতকে সেবা করার যে প্রবণতা তা বাঙালী চরিত্রেরই বিশিষ্টতা। সে মনে করে মানুষকে সেবা করা মানেই ঈশ্বরকে সেবা করা। ঈশ্বর বাঙালীর সব কিছু। দুঃখে-দৈন্যে, রোগে-শোকে, আনন্দে-কর্মে সে স্মরণ করে ঈশ্বরকে। ঈশ্বর-চেতনা মানেই ধর্ম-চেতনা। মনে হয় সৃষ্টির আদিতে ঈশ্বর বুঝি ইচ্ছা করেই ধর্মের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বাংলার জলবায়ুতে। তাই এর বীজ বাঙালী হৃদয়ের গভীরে মূল বিস্তার করে দিয়েছে—সবার অলক্ষ্যে। তাই কোন অবস্থাতেই ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে সে চিন্তা করতে পারে না।

যুগে যুগে কত রাজা এলো—কত রাজা গেল! কত সংস্কৃতির উত্থান পতন হলো। বিচিত্র তাদের আচরণ, বিচিত্র তাদের ধর্মবিশ্বাস! কিন্তু কোন কিছুতেই বাঙালী তার নিজ বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দেয়নি। বরং সব কিছুকে গ্রাস করে আপন মনের মাধুরীতে আপনিই হয়ে উঠেছে সমুজ্জ্বল। এজন্যই বিশ্বের সকল জাতির মধ্যে বাঙালীকে আলাদাভাবে চেনা যায়।

বাঙালীর ক্রিয়া-কর্ম, বাঙালীর আচার ব্যবহার, বাঙালীর ধ্যান ধারণা, বাঙালীর সাহিত্য-কর্ম সবকিছুতেই তার এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় সবিশেষ লক্ষ্যযোগ্য।

এই যে বাঙালী স্ব-মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে—এর কারণ নির্ণয় করতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই প্রকৃতির দিকে দৃকপাত করতে হবে। বাংলাদেশের জলবায়ুর মধ্যে এমন এক মাদকতা মিশানো আছে যার দরুন প্রকৃতি একদিকে হয়েছে সবুজ শ্যামল—অন্যদিকে হয়েছে রুদ্র ভয়ঙ্কর। এদেশের মানুষের মনের উপরও পড়েছে এই প্রকৃতির ছাপ। শস্য-শ্যামল মাঠ, সবুজ গাছ-গাছালি, পাখির মন মাতানো গান, বহমান নদীর কলস্বর এদেশের মানুষকে করে তুলেছে ভাবুক—উদাস। কিন্তু তাই বলে সে বৈরাগীর একতারা হাতে নিয়ে বিবাগী হয়ে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারে না। সংসার জীবনে তাকে করতে হয় সংগ্রাম—কঠোর সংগ্রাম। জীবিকার অন্বেষণে, বেঁচে থাকার প্রয়োজনে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাকে ক্ষেতে-খামারে, শহরে-গঞ্জে, কলে-কারখানায় উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়। তারই মাঝে দু'দণ্ড অবসর যখন হাতে আসে, তখন সে বসে পড়ে গাছের ছায়ায়—পর্ণ-কুটিরের দাওয়ায়। সুদূর দিগন্তে ক্লান্ত দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলে ভাবনা আপনা থেকেই অন্তরে এসে ঘুরপাক খেতে থাকে। সে ভাবনা প্রধানতঃ ঈশ্বর-চিন্তার দ্বারাই প্রভাবিত।

সংসারের প্রতি দায়িত্ববোধের প্রেরণায় তাকে সংগ্রাম করতে হয় ঠিকই, কিন্তু "লক্ষ্য তার রণ ক্ষেত্র নয়—সাধন ক্ষেত্র। সে সাধনা জীবনসাধনা। আত্মার সাধনা। অন্য কিছুতে তার হৃদয় নেই—হৃদয় তার একতারার সহজ সুরে।" তাইতো সংসারে সংগ্রামী ভূমিকায় দাঁড়িয়ে কর্তব্যের যূপকাষ্ঠে মাথা দিয়েও "দৃষ্টি তার বার বার ফিরে যায় বনবীথির শান্ত-ছায়ায়—নদীর উপলখণ্ডে।"

বাস্তব জীবনে এই দ্বৈতচাপের মধ্যে পড়ে অধিকাংশ মানুষই হারিয়ে যায় সংসারের শত চোরাগলির ভিড়ে। আবার কেউ কেউ বেরিয়ে আসে প্রাণান্তিক শক্তিতে কাঁধের জোয়াল ফেলে দিয়ে; সংগ্রামের হাতিয়ার নিক্ষেপ করে ছুটে যায় বিজন ভূমিতে—জনপদের এক প্রান্তে নির্জন কুটিরে। আধ্যাত্মিক চিন্তা ভাবনায় হৃদয় তাদের আপ্লুত হয়ে ওঠে। অন্তরে অনির্বাণ আলোর শিখা জালিয়ে তারা অন্বেষণ করতে থাকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অতল

অন্ধকারের আড়ালে রয়েছে যে রহস্যময়—তাকেই। ভোগবিলাস, কামনা-বাসনা প্রভৃতি ষড়-রিপুর দ্বারা তাড়িত সাধারণ মানুষের মত তখন আর তারা থাকে না। তখন তারা অধ্যাত্মবাদী—মরমী সাধক। ভজন-সাধন আর আরাধনার দ্বারা ঈশ্বরকে পাওয়াই হয় তাদের মূল লক্ষ্য। তাদের অন্তরের আবেগ-আকুতি-ধ্যান-ধারণা সম্পৃক্ত রচনাকেই বাংলা সাহিত্যে "মরমী সাহিত্য'' নামে আখ্যায়িত করা হয়। আসলে অধ্যাত্ম জীবন সম্পর্কিত গভীর অনুসন্ধিৎসা তাদের মর্মমূলে যে ভাবের সৃষ্টি করে—সেই ভাবের বাণীময় রূপই 'মরমী সাহিত্য'। এ সাহিত্য নির্ঝরিণীর মত স্বতোৎসারিত—মর্মমূল থেকে উৎসারিত। 'মরমী' শব্দটি ইংরেজী Mystic শব্দের প্রতিরূপ। Mystic অর্থ অতিন্দ্রিয়বাদ—অধ্যাত্মবাদ। এই অতিন্দ্রিয়বাদ বা অধ্যাত্মবাদ বা ঐশ্বরিক চেতনা বাঙালীর সহজাত প্রবণতা। তাদের এই চেতনা জন্মেছে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নানাবিধ জিজ্ঞাসা থেকে। কে এই জগতের নিয়ন্তা, কি তার স্বরূপ, মানব জীবনের উৎস কি, কেনই বা জীবন সৃষ্টি হলো পৃথিবীতে, কি তার উদ্দেশ্য, পরিণতিই বা কি—ইত্যাকার প্রশ্নরাজি বাঙালীর ভাবুক দৃষ্টিকে করে তুলেছে তত্ত্বাশ্রয়ী। এসব চিরন্তন জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতে খুঁজতে দৃষ্টি তার চলে যায় সুদূর রহস্যালোকের অন্ধকার রাজ্যে। খুঁজতে থাকে তার সিংহ-দরজার চাবি। সেই চাবি যার হস্তগত হয় সে সিদ্ধপুরুষ—যার হয় না সে ব্যাকুল হয়ে মাথা খুঁড়তে থাকে সেই অন্ধকারের বদ্ধ দুয়ারের সামনে। এমনি করেই গড়ে উঠেছে অধ্যাত্মবাদ বা মরমীবাদ।

মরমীবাদের পরিচর্যা করা হয় মরমী সাধনার মধ্য দিয়ে। বাংলা-দেশে মরমী সাধনার বহু ও বিচিত্র পন্থা রয়েছে। বিভিন্ন ধর্মমতকে কেন্দ্র করেই এসব পন্থার উদ্ভব। যেমন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সাধনা, নাথ সাধনা, হিন্দু যোগ সাধনা, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি। তবে এসব সাধনার সঙ্গে ইসলামের সূফী সাধনা মিশ্রিত হয়েই বাংলার মরমী সাধনাকে ব্যাপক, উজ্জ্বল ও শক্তিশালী করে তুলেছে।

এই শক্তিশালী মরমী সাধনার স্বরূপটিকে বুঝতে হলে আমাদের জানতে হবে সামাজিক পটভূমি। আগেই বলেছি—এদেশে যুগে যুগে নানাজাতির শাসন কায়েম হয়েছে আবার পতন হয়েছে। এমনি করেই এসেছে বৌদ্ধ হিন্দু এবং সর্বশেষে মুসলমান। ইতিহাসে জানা যায় সেন রাজাদের শাসনের শেষভাগে সমাজে নানাবিধ অনাচার ও কুসংস্কার চরমে উঠেছিল। দেশের

মধ্যে যে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল তারও কারণ ছিল। হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ শাসিত। ব্রাহ্মণরা উচ্চকোটির লোক। এরাই দেশের শাসন ক্ষমতার প্রতিভূ। সমাজে বর্ণভেদ প্রথা প্রচলিত থাকায় একবর্ণের লোকেরা অন্যবর্ণের লোকদের ঘৃণা ও অবিশ্বাস করতো। পরস্পরের মধ্যে মিল তো দূরের কথা বরং স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতো। উচ্চকোটির ব্রাহ্মণরাই ছিল ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় শাসনের অধিকারী। তারা কেবল নিজেদের সুখ সুবিধা নিয়েই মশগুল থাকতো। অন্যের স্বার্থ সংরক্ষণের চিন্তা বা ইচ্ছা কোনটাই তাদের ছিল না। সমাজে বৌদ্ধ বা অন্য ধর্মাবলম্বী যারা ছিল তারা এদের ভয়ে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছিল। সেই লাঞ্ছিত জনমনের বদ্ধ বাতায়নে ইসলামের উদার হাওয়ার ফিসফিসানি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছিল।

আরবের মুসলিম বণিকেরা ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এদেশে বহু আগে থেকেই আসা যাওয়া শুরু করেছিল। তাদের প্রভাবে এদেশের নিম্নশ্রেণীর বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করে জীবনের মোড় ঘুরিয়ে ফেলেছিল। সেই সময় ইরান, পারস্য থেকে বহু দরবেশ সাধক ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে আগমন করেন। এঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ইসলামের প্রচার ও প্রসার বাড়তে থাকে। এই সময় দেশে হিন্দুদের সঙ্গে বৌদ্ধদের ও হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের ধর্মীয় মতবাদের পার্থক্য হেতু বিদ্বেষ যেমন চরমে উঠেছিল তেমনি উচ্চকোটির সুবিধাপ্রাপ্ত সুখী মানুষের সঙ্গে নিম্নকোটির উৎপীড়িত মানুষের বিরোধ ও বৈষম্য চরমে উঠেছিল। ঠিক এই অবস্থায় তুর্কীরা অভিযান চালিয়ে এদেশ দখল করে নেয়। মুসলমান শাসন কায়েম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু পীর-দরবেশ-আউলিয়া ও সুফী সাধক আরব ও মধ্য এশিয়া থেকে আগমন করলেন ইসলামের মহান বাণী প্রচারকল্পে ও মানুষের আত্মিক সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে। তাঁরা প্রচার করলেন এক নূতন কথা ঃ আত্মা সকল শক্তির উৎস। যদি সাধনার দ্বারা, সংস্কৃতির দ্বারা আত্মাকে উন্নত করা যায় তবে মানুষ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে। আধ্যাত্মিক সাধনাই আত্মার কল্যাণ আনতে সক্ষম। এসব সাধকেরা অনাড়ম্বর ও নির্লোভ জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে ইসলামের আদর্শকে এমনভাবে প্রকটিত করলেন যা দেখে সাধারণ মানুষেরা অভিভূত হয়ে পড়লো। অত্যাচারিত জনগণ মুক্তির পথ পেলো। অগণিত লোক ইসলাম গ্রহণ করে চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীকে নতুন করে সাজালো। যারা ইসলাম গ্রহণ করলো না তারাও এর প্রভাবকে

অস্বীকার করতে পারলো না। নিজেদের ধর্মমতের সঙ্গে সূফীমতকে মিশিয়ে এক উদার মতবাদের সৃষ্টি করে ঈশ্বরের সাধনায় ব্রতী হলো। এতকাল অসংখ্য দেবদেবীর পূজারী ছিল যে জাতি তারা এবার সকল শক্তির উৎস হিসাবে এক আল্লাহ্‌কে চিনতে শিখলো। তাদের নবজাগ্রত আত্মা সাধনার যে পথ বেছে নিল তাতে কেউ হলো বৈষ্ণব সহজিয়া প্রেমপন্থী, কেউ হলো প্রেমপন্থী বাউল আবার কেউবা সূফী সাধক। সমস্ত বিদ্বেষ ও বিভেদ ভুলে গিয়ে তারা জীবনের এক নতুন অর্থ খুঁজে পেলো। সূফী দরবেশদের কাছ থেকে তারা লাভ করলো আধ্যাত্মিক সম্পদ।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় এসব সূফীদের আখড়ায় বহু ভক্ত ও শিষ্যের আনাগোনা হত। জাতিধর্মের কোন বাছ-বিচার ছিল না। এখানে ধর্মালোচনা হতো। সূফীরা মানুষকে উন্নত জীবনের বাণী শোনাতেন—আত্মার বিকাশ সাধনের পন্থা বাতলে দিতেন। তাঁদের আধ্যাত্মিক সাধনায় অনুপ্রাণিত হয়ে ভক্ত-শিষ্যরাও সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছে। পরবর্তীকালে তারাও সিদ্ধিলাভ করে কর্ম ও আদর্শের দ্বারা সমাজ-মানসকে প্রভাবান্বিত ও অনুপ্রাণিত করেছে।

একদিকে সূফী দরবেশদের প্রভাব—অন্যদিকে সহজাত প্রবণতা, এই দ্বিবিধ কারণ বাংলার মরমী সাধনার শক্তিশালী ভিত্তি গঠন করে এই সাধনাকে উত্তরোত্তর ঐশ্বর্যময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী করে তুলেছে। মরমী সাহিত্য বাংলাদেশের এক গৌরবময় ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধকেরা ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য, ক্লেদাক্ত সংসারের প্রতি মুখ ঘুরিয়ে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে শাশ্বত আনন্দ লাভের জন্য যে সাধনা করেছে তাদের সেই স্বরূপ ব্যক্ত হয়েছে মরমী সাহিত্যের মধ্যে। তাদের প্রাণের একতারায় যে বেদনা মঞ্জরিত হয়েছে—কাঙ্ক্ষিতকে পাওয়ার জন্য যে আকুতি প্রকাশ পেয়েছে সেগুলিরই স্বতঃস্ফূর্ত বাণীরূপ মরমী কবিতা ও গান। এই জাতীয় সাহিত্যের আবেদন আমাদের দেশে চিরন্তন। তার কারণ—আগেই বলেছি এদেশের মানুষের হৃদয় ঈশ্বর-ভাবনায় উন্মথিত। শত চিন্তার মধ্যেও আধ্যাত্মিক পিপাসা জেগে থাকে তাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে। সুতরাং এ জাতীয় কবিতা ও গানগুলি যে সহজেই তাদের হৃদয়ে সাড়া জাগাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া আরও একটি কারণ আছে। বাংলাদেশের মানুষ প্রকৃতিগত কারণেও কিছুটা দুর্বল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এদেশের মানুষ

বছরের পর বছর যেভাবে মার খায় এমনটি বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন দেশে নয়। দুর্ভিক্ষে, রোগে-মারিতে, ঝড়ে ঝঞ্ঝায়, বন্যায়, ভাগ্যের লাঞ্ছনায় ক্ষত বিক্ষত হৃদয়ে যখন আর কোন দিক থেকেই সান্ত্বনার আশা থাকে না, তখন এই আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ কবিতা ও গানগুলি যেন তাদের অন্তরে স্নিগ্ধ শান্তির বারি বর্ষণ করে। সংসারের উষর ক্ষেত্র থেকে দু'দণ্ডের জন্য হলেও টেনে নিয়ে যায় শাশ্বত জগতের দিকে। এজন্যই মরমী সাহিত্য বাঙালীর এত প্রিয়। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই এর রস গ্রহণ করে থাকে।

॥ ২ ॥

বাংলা মরমী সাহিত্যের উৎস

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় সাহিত্যের সেই উষালগ্নেই মরমী সাহিত্যের অঙ্কুরোদগম হয়েছিল। বাংলাদেশ কবিতার দেশ—গানের দেশ। স্নিগ্ধ শ্যামল পটভূমিতে নরম পলিমাটি গঠিত বাংলার মানুষের মনও নরম। প্রকৃতির সহজ গুণেই মানুষের অতল মন থেকে যে ভাবরাশি বেরিয়ে আসে তাও কবিতা বা গান। তাই দেখা যায় বাংলার প্রাচীনতম সাহিত্যের যে নিদর্শনটি আমরা পেয়েছি তা কবিতা। বাংলা সাহিত্যের সারা মধ্যযুগ ব্যাপী যতকিছু রচিত হয়েছে সবই কবিতা। এদেশই কাব্যপ্রধান। সুতরাং যদি বলি বাংলাদেশের মরমী সাহিত্য বলতে যা বুঝায় তা সবই কবিতা কিম্বা গান তবে একটুও অত্যুক্তি হবে না। বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের সাধকদের দ্বারা এই জাতীয় সাহিত্য রচিত হয়েছে। তাদের মধ্যে বৌদ্ধসিদ্ধাচার্য, নাথপন্থী সিদ্ধাই, সহজিয়া বৈষ্ণবকবি, বাউল, মুর্শিদি, মারফতী ফকিরদের রচিত কবিতা ও গান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এসব সাহিত্যের মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত যোগসূত্র রয়েছে। সে সূত্রটা হচ্ছে এর মূলভাব। প্রাচীনকালের সেই সিদ্ধাচার্যদের থেকে শুরু করে একালের বাউলদের পর্যন্ত আলোচনা করলে দেখা যায়, এরা সবাই সহজিয়া পন্থী মরমী সাধক। এদের রচনার মূল ভাবই যে এক—শুধু তাই নয়। আরও একটি কারণ আছে। আর তা হচ্ছে—বাংলাদেশে ব্যাপক সুফী প্রভাব।

আগেই বলা হয়েছে, এদেশের ইতিহাসই প্রমাণ দেয় যে মুসলমান শাসনের অনেক আগেই বাংলাদেশ তথা সারা ভারতে অনাচার ও কুসংস্কারজাত বিশৃংখলা প্রবল হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণ্যবাদের চাপে পড়ে সাধারণ মানুষের

জীবন দুর্বিষহ ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। দেশবাসীকে সেই দুর্যোগ থেকে রক্ষার জন্য মধ্য এশিয়ার ইরান, পারস্য প্রভৃতি দেশ থেকে সুফী-কামেল দরবেশগণ এদেশে আসেন ইসলামের মহান শান্তির বাণী বহন করে। এই সব সুফী দরবেশগণ কেবল যে উচ্চ মার্গের সাধক ছিলেন তাই নয়। তাঁরা ছিলেন একেকজন বড় বড় পণ্ডিত ও কবি। এদের দ্বারা ইরান-পারস্যের সুফী কবি হাফিজ, সাদী, রুমী, জামী প্রমুখের গজল গান এদেশে প্রচারিত হয়। এসব গজল গান এক সময় বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত করতো স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে। সুতরাং তখনকার কবি সাহিত্যিকেরা বিশেষ করে এসব সহজিয়া পন্থী সাধকেরা যে সুফী মতবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বৌদ্ধ দর্শনের মূল সুর চর্যাপদ আর নাথ সাহিত্যের উৎস। তাই এ দুটি সাহিত্য বৌদ্ধ দর্শন দ্বারা প্রভাবান্বিত। আর বৈষ্ণব পদাবলী, বাউল গান, মুর্শিদী, মারফতী, ইসলামী তথা সুফী ভাব দ্বারা প্রভাবান্বিত। ঈশ্বরকে পাওয়ার সাধনাই জীবনের চরম সাধনা। ঈশ্বরকে যারা ভালবাসে—ঈশ্বরও তাদেরকে ভালবাসেন—এই মহাসত্য ইসলামী দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শন উভয়েরই মূল কথা। বিভিন্ন স্তরের সাধকেরা এই মহাসত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তারা জীবনভর ঈশ্বরকে পাওয়ার সাধনাই করে গেছেন। এখানে বৌদ্ধ মতবাদ আর ইসলামী মতবাদে কোন প্রভেদ নাই। কাজেই চর্যাপদ, নাথ সাহিত্য, বৈষ্ণব সহজিয়া সাহিত্য, মুর্শিদী, মারফতী আর বাউল গানের মধ্যে রয়ে গেছে এক নিবিড় যোগসূত্র। বিভিন্ন সাধকের রচিত সাহিত্যে তারই পরিচয় বিধৃত রয়েছে। এই জাতীয় রচনা ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখা করেছে সত্য কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই মানব জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে সুন্দররূপে ফুটিয়ে তুলেছে। মরমীয়া সাধকদের ধ্যান-ধারণার দর্পণে বাংলার প্রকৃতি, বাংলার আচার বিচার, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিগুলি স্বতঃস্ফূর্ত ছায়াপাত ঘটিয়েছে। সেদিক থেকে এগুলি বাংলার লৌকিক জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সুরে বাঁধা। তার কারণ—এঁরা অধ্যাত্ম সাধনা করেছে বটে—ঈশ্বরকে—পরমাত্মাকে, সদ্‌গুরুকে, মুর্শিদ, সাঁই, দীন দয়াল, কৃষ্ণকে খুঁজেছে বটে কিন্তু সে খোঁজা অন্য কোথাও, অন্য কোনখানে নয়,—এই বাংলারই পথেঘাটে, বাংলারই নদীর কূলে, বাংলারই দিগন্ত বিথারী মাঠের আলে কিম্বা শ্যামচ্ছায়াময় অরণ্য কান্তারে চলেছে তাদের অন্তরঙ্গ অন্বেষণ। কাজেই বাংলা তাদের অধ্যাত্ম

সাধনার পটভূমি রূপে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে রচনার মধ্যে। এজন্য এ মরমী কবিতা বা গানগুলি বাস্তব রস সমৃদ্ধ হয়ে একদিকে যেমন সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করেছে অন্যদিকে মানুষের সহজাত আধ্যাত্মিক পিপাসাকেও চরিতার্থ করেছে।

বাংলা সাহিত্যে প্রাচীনতম যে নিদর্শনখানা আমাদের হাতে এসেছে তার নাম চর্যাচর্য বিনিশ্চয়। সংক্ষেপে বলা হয় চর্যাপদ। এখানে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল রাজ-দরবার থেকে উদ্ধার করে এনেছিলেন। এই পুস্তকখানির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করলে দেখা যায়, এটি মরমী বা Mystic সাহিত্যেরই পর্যায়ভুক্ত। কারণ এটি একটি বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের সাধন-ভজন সম্পৃক্ত হৃদয়ের আধ্যাত্মিক ধ্যান ধারণারই অভিব্যক্তি। যে যুগে চর্যাপদ রচিত হয়েছে সে যুগে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রাধান্য ছিল সারাদেশে। বৌদ্ধধর্মের মূল সুরের উপর ভিত্তি করে রচিত এই পদগুলি ধর্ম বিষয়ক কবিতা। এগুলি রচনা করেন বৌদ্ধ সহজিয়া পন্থী সাধকেরা। চর্যাপদে মোট সাড়ে ৪৬টি পদ পাওয়া গেছে। শাস্ত্রী মহাশয় সেগুলিকে "বৌদ্ধগান ও দোহা" নামে সঙ্কলিত করেন। এতে মোট ৩৩ জন সিদ্ধাচার্যের নাম পাওয়া গেছে। তার মধ্যে কাহ্নপাদ, ভুসুকুপাদ, শবরীপাদ, ডোম্বীপাদ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সব সাধকের বাস্তব জীবনের পটভূমিতেই আধ্যাত্মিক সাধনা করেছেন। চর্যাপদগুলি তাই জীবনের বহুবিধ চিত্রে সমৃদ্ধ হয়ে রসমণ্ডিত রূপ লাভ করেছে। আসলে চর্যারচয়িতাদের লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষ। তাদের সাধন পদ্ধতি সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে জ্ঞানদান করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। তাই সাঙ্কেতিক ভাষায় সাধন পদ্ধতি ব্যক্ত করলেও সেগুলি যাতে সাধারণ জনসমাজে গ্রহণযোগ্য হয় সেজন্য তাঁরা তৎকালে সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রচলিত সংস্কৃত ভাষাকে পরিত্যাগ করে বাংলা ভাষাতেই ছন্দ রচনা করেন। এবং এটাও তাঁরা বুঝতেন যে দুরূহ তত্ত্বজ্ঞান কখনও সাধারণের হৃদয়ে স্থান পাবে না। তাই তারা সরস বাক্যে, অনুপ্রাস-অলঙ্কারে সুসজ্জিত করেই চর্যাপদগুলি রচনা করেছেন। ফলে এগুলির সাহিত্যিক মূল্য বর্ধিত হয়েছে। এই পদগুলি বিভিন্ন ছন্দে রচিত এবং রীতিমত গাওয়া হতো। তার কারণ প্রত্যেকটি পদের সঙ্গে তার রাগ-রাগিনীর উল্লেখ রয়েছে। যেমন: রাগ দেশাখ, রাগ পটমঞ্জরী, রাগ বাড়াটি, রাগ মালসী, রাগ গউড়া ইত্যাদি। প্রত্যেকটি পদের শেষে ভনিতা আছে। তা দেখে রচয়িতার নাম পাওয়া যায়। পদগুলির

অন্তর্নিহিত অর্থ যেটা সেটা সাধকেরা গুরু পরম্পরায় জানতে পারতেন।

যে সময়ে চর্যাগান রচিত হয়েছে তখন বাংলা প্রাকৃতের খোলস ছেড়ে কেবলমাত্র বেরিয়ে এসেছে। তাই এর ভাষা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়। কিন্তু তাই বলে এর বাহ্যিক অর্থ বোঝা তেমন কোন কঠিন ব্যাপার নয়। যেমন ঃ

মন্ত ন তন্ত ন ধেয় ন ধারণ।
সব্ববি বে বড় বিব্ভম কারণ।
পণ্ডিত সঅল সখ বক্খানই।
দেহহি বুদ্ধ বসন্তি ন জানই ।।

কি চমৎকার যুক্তিপূর্ণ কথা! মন্ত্র তন্ত্র ধ্যান ধারণার কোনই প্রয়োজন নেই। এগুলিই যত বিভ্রমের কারণ। পণ্ডিতেরা সত্য ব্যাখা করেন বটে কিন্তু সেতো বাইরের ব্যাপার। দেহের মধ্যেই যে পরম জ্ঞান বাস করেন সে খবর তো তারা রাখেন না।

স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে এইসব সাধকেরা তথাকথিত মন্ত্রে তন্ত্রে বিশ্বাস করতেন না। দেহকেই তারা বলেছেন পরম জ্ঞানের আধার। সহজাত বৃত্তিগুলির চরিতার্থ সাধন করে দেহের অন্তঃস্থিত শক্তিকে আগে আয়ত্তে আনতে হবে। তারপর সেই শক্তির সাহায্যে অসীম শূন্যতায় শাশ্বত-স্বরূপের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরম আনন্দ লাভ করতে হবে। যে শাশ্বত রূপের সন্ধান পায় তার হয় দুঃখের চির নিবৃত্তি। সে মহাসুখে কাল কাটাতে পারে। তাই চর্যাপদের সাধক বলেন ঃ

ঘরে অচ্ছই বাহিরে কুই পুচ্ছই।
পই দেক্খই পড়িবেশী পুচ্ছই ।।

অর্থাৎ ঘরেই—দেহাভ্যন্তরে আছে যে শক্তি তাকে বাইরে কেন খোঁজাখুঁজি কর? আগে ঘর দেখ—তারপর প্রতিবেশীকে জিজ্ঞেস কর। এই হচ্ছে চর্যার মর্মরূপ। এই গীতিগুলির মধ্যেই বাংলা গানের সুর প্রথম স্পন্দিত হয়েছে। বাংলা মরমী সাহিত্যের ভিত্তিও এই চর্যাপদগুলিই। চর্যাকারগণ তাদের মরমী সাধনার যে সংকেত দিয়েছেন নিম্ন পদটিতে তা চমৎকার রূপে ব্যক্ত হয়েছে ঃ

কা আ তরুবর পঞ্চবি ডাল।
চঞ্চল চীত্র পইঠা কাল।

দিঢ় করিঅ মহাসুখ পরিমাণ
লুই ভনই গুরু পুচ্ছিঅ জান।
সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
সুখ দুখেতে নিচিত মরিঅই।
এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করনক পাটের যাম।
সুখপায় ভিত্তি লেহুরে পাম।
ভনই লুই আমহে ঝানে দিঠা
ধমন চমন বেনি পিণ্ডি বইঠা।

সিদ্ধাচার্য লুইপা রচিত এই পদটির মর্মার্থ নিম্নরূপ ঃ

"দেহকে বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। বৃক্ষের শাখা পল্লবের ন্যায় ষড়িন্দ্রিয় বিষয়াদি গ্রাহ্য গ্রাহকভাবে কায়াতরুর শাখা পল্লব রূপে কল্পিত হইয়াছে। আমাদের এই বোধিচিত্ত ধর্মকায় (পরমাত্মা) হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্বভাবতঃই আনন্দময় প্রকৃতি বিশিষ্ট। কিন্তু অবিদ্যার আবরণে ইহা সংবৃত্ত আছে বলিয়াই বিষয়ের আকর্ষণে চিত্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। এবং তাহাতেই আমরা বিবিধ দুঃখ ভোগ করিয়া কাল কবলিত হই। অতএব এই চঞ্চলতা দূরীভূত করিয়া মহাসুখ লাভ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার উপায় জানিতে হয়। ইহাই পদকর্তা লুইপাদের উপদেশ।"

প্রকৃতপক্ষে জাগতিক সুখ-ভোগের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও বাসনার মোহজালে আবদ্ধ আছি বলেই আমাদের দুঃখের অন্ত নেই। এই মোহজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে না পারলে মহাসুখ লাভ করা যাবে না। সুতরাং বাসনার মোহজাল যদি ছিন্ন করতে হয় তবে শূন্যতত্ত্ব অর্থাৎ জাগতিক বিষয়সমূহ যে অসাড় মায়ামাত্র এই জ্ঞান লাভের সাধনা করতে হবে। এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই সূফীতত্ত্বের মধ্যে। মোট কথা চর্যাপদেই মরমী সাহিত্যের দ্বার উদঘাটিত হয়েছে। কম্বলিপাদ বিরচিত একটি পদ আলোচনা করলে আমরা তার স্পষ্ট সমর্থন পাই। যেমন ঃ

খুন্টি উপাড়ি মেলিলি কাচ্ছি
বাহতু কমলি সদগুরু পুচ্ছি।
মাঙ্গত চড়হিলে চউদিস চাহঅ
কেড়ুআল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ।

বাম দাহিন চাপী মিলি মিলি মাঙ্গা
বাটত মিলিল মহাসুহ সাঙ্গা ।।

অর্থাৎ ("নৌকা বাইতে গিয়ে) খুঁটি উপড়ে যেলো, কাছি মেলে দাও। সদগুরুকে জিজ্ঞাসা করে, হে কম্বলিপাদ ! তুমি যেয়ে যাও। পথে বেরিয়ে চারিদিকে চেয়ে যেয়ো। কেড়ুআল ছাড়া কেউ কি বাইতে পারে? বাম ডানে চেপে চেপে পথ চেয়ে গেলে ঐ পথেই মহাসুখের সঙ্গে মিলে যাবে।'' এই পদের মধ্যে 'মহাসুখ' 'সদগুরু' প্রভৃতি শব্দগুলি মরমী সাধনারই সংকেত বহন করছে।

॥ ৩ ॥

মরমীয়া ধারায় নাথ সাহিত্য

নাথ সাহিত্য বৌদ্ধ যুগেরই রচনা। বাংলা সাহিত্যের আদি লেখক বলে পরিচিত মৎসেন্দ্রনাথ (যিনি মীননাথ নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ) নাথ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি বাঙ্গালী এবং সহজি মতবাদী। এঁরই শিষ্য গোরক্ষ নাথ ও অন্যান্য যোগীদের দ্বারা এই সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি ঘটে। নাথ ধর্মমত বৌদ্ধ দর্শনের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধধর্মে যে শূন্যতত্ত্বের কথা বলা হয়েছে নাথ সিদ্ধারাও সেই শূন্যতত্ত্বেই বিশ্বাসী। তারা মনে করেন কায়া সাধনার দ্বারা আগে দেহ শুদ্ধ করতে হবে। ত্যাগ তাঁদের প্রধান ব্রত। কায়া সাধনা ও ত্যাগব্রতের দ্বারা দেহ ও চিত্ত শুদ্ধ করলেই শূন্যমার্গে বিচরণের শক্তি অর্জন করা যায়। তখনই হওয়া যায় মহাসুখের ও শক্তির অধিকারী সিদ্ধাই।

বৌদ্ধ শাসনামলে এসব সিদ্ধারা ধর্ম বিষয়ক মরমী কাব্যসমূহ রচনা করেন। এই ধরনের রচনার উদ্দেশ্য ছিল নাথ সিদ্ধাইদের জীবনের অলৌকিক ঘটনা ও নাথ ধর্মের মহিমা প্রচার করা। সিদ্ধারা ছিলেন অলৌকিক শক্তির অধিকারী। ইচ্ছামত তারা শূন্যে বিচরণ বা অসাধ্য সাধন করতে পারতেন। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে ডঃ গ্রীয়ারসন নাথ সাহিত্যের প্রথম পুঁথি আবিষ্কার করেন। The Song of Manik Chandra নাম দিয়ে তিনি এটি রোমান হরফে প্রকাশ করেন। মানিকচন্দ্র রাজার স্ত্রী ময়নামতী ছিলেন শ্রেষ্ঠ নাথ সিদ্ধাদের একজন। স্বামীর মৃত্যুর পরে ময়নামতী অলৌকিক শক্তির দ্বারা এক পুত্র লাভ করেন। এই পুত্র গোবিন্দচন্দ্র বা গোঁপী চাঁদ অল্প বয়সেই বন্ধুদের কুপ্রভাবে অদুনা ও পদুনা নাম্নী কুমারীদেরকে বিয়ে করে সংসার সুখে মগ্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু ময়নামতী জানতেন সাধনার দ্বারা সিদ্ধদেহের

অধিকারী না হতে পারলে গোপীচাঁদের মৃত্যু অবধারিত। তাই তিনি পুত্রকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষা নিতে উপদেশ দেন। এই উদ্দেশ্য সাধন করতে যেয়ে তাঁকে দুঃসহ কষ্ট বরণ করতে হয়। অবশেষে সব প্রতিকুলতা অতিক্রম করে পুত্রকে সিদ্ধাই হাড়ি পার শিষ্যত্ব বরণ করতে বাধ্য করেন। গোপী চাঁদ অনেক কষ্ট সাধনার দ্বারা সিদ্ধাই হতে পেরেছিলেন। এই হচ্ছে মানিক চন্দ্র রাজার গানের মর্মকথা।

'গোরক্ষ বিজয়' এর কাহিনী অলৌকিক শক্তির কাহিনী। নাথ ধর্মের আদি গুরু মৎসেন্দ্র নাথ বা মীননাথ নারী শাসিত কদলী রাজ্যে গিয়ে ভবানীর শাপে সিদ্ধত্ব হারিয়ে ফেলেন। অসংযত চিত্তে সেখানে অনাচারের জীবন যাপন করতে থাকেন। তার শিষ্য গোরক্ষ নাথ ছদ্মবেশে সেখানে গিয়ে গুরুকে অনেক কষ্টে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। এই কাহিনী মূলতঃ ধর্ম বিষয়ক কাহিনী। নাথ ধর্ম আচরণে কিভাবে বিপদ মুক্ত হওয়া যায় সেই মহিমা প্রচারই এর আসল লক্ষ্য। আত্মসংযম চরিত্রবল, গুরুভক্তি প্রভৃতি গুণরাশির দ্বারা কিভাবে ইন্দ্রিয় লালসাকে পর্যুদস্ত করা যায় এ হচ্ছে তারি স্বতঃস্ফূর্ত বর্ণনা। অলৌকিক জ্ঞান আয়ত্ত করে অমরত্ব লাভ করতে হলে যে কতখানিক কঠোর সাধনার ও জাগতিক ভোগ-বিলাসের প্রতি নির্মোহ হওয়া প্রয়োজন নাথ সিদ্ধারা তাদের জীবন থেকে উদাহরণ দিয়ে তা প্রমাণ করে গেছেন। নাথ কাব্যের মধ্যে চিত্তাকর্ষক কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে নাথ ধর্ম ও সাধন প্রণালীর গূঢ়তত্ত্ব সাঙ্কেতিক ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন ঃ

নাচন্ত যে গোর্খ নাথ তালে করি ভর
শূন্যেতে নাচয়ে গোর্খ দেখে সর্ব নর
নাচন্ত যে গোর্খনাথ ঘাগরের রোলে
'কায়া সাধ, কায়া সাধ' মাদলেতে বোলে।

সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে হলে যে 'কায়া সাধনার' একান্ত প্রয়োজন সে কথা চর্যাপদের সিদ্ধাদের মত নাথ সিদ্ধারাও বলেছেন বিভিন্ন সঙ্কেতে।

মধ্যযুগে অনেক হিন্দু ও মুসলমান কবি নাথ সাহিত্যের পুঁথি রচনা করেছেন। ময়মনসিংহ গীতিকা রচয়িতা কবিদের মত এরাও গ্রাম্য কবি। এরা নাথ সিদ্ধাদের রচনার গঠন প্রণালী অনুসরণ করে এসব মরমী গীতের পুঁথি রচনা করেন। এসব কবিদের মধ্যে শেখ ফয়জুল্লার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁকেই নাথ সাহিত্যের আদি লেখক বলে ধরা হয়।

॥ ৪ ॥

বৈষ্ণব কবিতার মরমী রূপ

মধ্যযুগের সাহিত্যের একটি প্রধান অবদান বৈষ্ণব কাব্য। রাধা কৃষ্ণের প্রণয়-লীলাকে কেন্দ্র করে এই বৈষ্ণব সাহিত্যের উদ্ভব। সারাটি মধ্যযুগ ধরে বাংলা সাহিত্যের আকাশে বাতাসে বৈষ্ণব প্রেমের সুর-মাধুর্য ধ্বনিত হয়েছে। কৃষ্ণ পৌরাণিক দেবতা। আর রাধা লৌকিক মানসের সৃষ্টি। পৌরাণিক নায়ককে লৌকিক নায়িকার সঙ্গে যুক্ত করে প্রণয়-লীলার যে রূপ দেখানো হয়েছে তা বাংলার লোক মানসেই জন্ম নেয়। রাধা সাধারণ মানবী—সংসারের শত বন্ধনে আবদ্ধা। আর কৃষ্ণ দেবতা। সেই দেবতার সঙ্গে মানবীর প্রেম সম্পর্ক দেখানো হয়েছে সম্ভবত এই কারণে যে বাংলার মানুষ দেবতাকে 'দেবতা' বলে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না কোনদিন। দেবতার সঙ্গে তাদের আত্মার সম্পর্ক। দেবতাকে তারা পেতে চায় ভাইয়ের মত, বন্ধুর মত—প্রেমিকের মত। তাই প্রেমাস্পদ দেবতা কৃষ্ণের সাথে রাধার সহস্র প্রেমের লীলা দেখিয়ে বাংলার মানুষ তাদের নিজেদের আত্মার বাসনাকে ব্যক্ত করেছে। তারা মনে করে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের প্রেমের সম্পর্ক। ভক্ত চায় ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হতে। তাই সারা বৈষ্ণব কাব্য রাধা কৃষ্ণের প্রেমের বন্যায় প্লাবিত। সেখানে ভক্ত ও ভগবানের—রাধা ও কৃষ্ণের একাত্ম হওয়ার সীমাহীন আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে।

সই কেবা শোনাইল শ্যাম নাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মনপ্রাণ।

কবি চণ্ডীদাস রচিত এই পদে দেখা যায়—শ্যাম নাম রাধার কর্ণে প্রবিষ্ট হয়ে তার সমস্ত চিত্তকে আকুলিত করে তুলেছে। এই যে আকুলতা—

এ কেবল রক্তমাংসে গড়া সাধারণ মানবীর প্রিয় সন্দর্শনের আকুলতা নয়। এ হচ্ছে সংসার পিঞ্জরে আবদ্ধ স্থূল জগতের চাপে নিষ্পিষ্ট জীবের সহসা সচেতনতা। আত্মার জাগরণ। ঈশ্বর বিস্মৃত মানসের ঈশ্বরের নাম শুনে হঠাৎ করে বিস্মৃতির ঘোর কেটে যাওয়া এবং ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাওয়ার—তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকুল ক্রন্দন। প্রেম ব্যাকুলা রাধা মুরলীধারী কৃষ্ণের প্রেমিকা রজকিনী রামী নয়—এ হচ্ছে নিখিল বিশ্বের প্রেম-ব্যাকুলিত সকল জীবাত্মার প্রতীক। আর কৃষ্ণও বৃন্দাবন বিহারী গোপীজন মন হরণকারী মুরারী মোহন নয়—এ হচ্ছে স্বয়ং ঈশ্বর বা পরমাত্মার প্রতীক—অসীম প্রেমের অধিকারী। পরমাত্মা অসীম প্রেমের অধিকারী বলেই জীবাত্মাকে কখনো ভোলে না। জীবাত্মা ভুলে থাকে পরমাত্মাকে। কিন্তু সেই বিস্মৃত চেতনা যখন জাগ্রত হয় কোন সংকেতে, তখন সে পরমাত্মার কাছে মিলিত হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসের একটি পদে এই ব্যাকুলতা অতি চমৎকারভাবে ধরা পড়েছে ঃ

মানস গঙ্গার জল ঘন করে ছল ছল
দুকূল বহিয়া যায় ঢেউ
গগনে উঠিল মেঘ' পবনে বাড়িল বেগ
তরণী রাখিতে নারে কেউ।
অকাজে দিবস গেল নৌকা নাহি পার হৈল
পরাণ হৈল পরমাদ
জ্ঞানদাস কহে আঁখি স্থির হৈয়া থাক দেখি
এখনি না ভাবহ বিষাদ ।।

কবি ভাবছেন নিতান্তই অকাজে জীবনের দিনগুলো তো চলে গেল। এখন ভবনদী পাড়ি দিতে হবে। কিন্তু দুর্যোগঘন উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল নদীর রূপ দেখে প্রাণ ভীত ও ব্যাকুল হয়ে পড়ে। তাই প্রেমিক কবি নিজের আত্মাকে নিজেই সান্ত্বনা দেন ঃ এখনি বিষাদগ্রস্ত হয়ো না। পরম প্রেমিকের কাছে ফিরে যেতে হলে এমনিতরো দুর্যোগ পাড়ি দিতেই হবে।

মধ্যযুগে অসংখ্য কবি রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিষয়ক কবিতা রচনা করেছেন। তাদের সকল কবিতাই যে খাঁটী বৈষ্ণব মরমী কবিতা হয়েছে তা বলা চলে না। প্রেমের আকুলতা যেখানে স্থূলতাকে অতিক্রম করে আধ্যাত্মিকতাকে স্পর্শ করেছে—"দেহের বুভুক্ষা এবং অবৈধ প্রেমের উত্তেজনা যেখানে আত্মদানের

উৎকণ্ঠা এবং সর্বস্ব পণের দৃঢ়তায় প্রশান্তি পেয়েছে, সেখানে লোক-কাব্যের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে বৈষ্ণব কবিতার প্রাণস্বরূপ।" অর্থাৎ এখানেই বৈষ্ণব কবিতায় মরমীরূপ আরোপিত হয়েছে। বৈষ্ণব কবিরাও সহজ সাধক। চর্যাপদের সিদ্ধাচর্যদের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে অনেক বিষয়েই এদের মিল রয়েছে। তত্ত্বের দিক দিয়ে উভয় সম্প্রদায় একই আদর্শের অনুসারী। তবে যে তত্ত্বকে চর্যাকাররা রূপকের কঠিন আবরণে ঢেকে দুর্বোধ্য করে প্রকাশ করেছে, বৈষ্ণব কবিরা তাকেই সরস কবিত্বমণ্ডিত ভাষায় প্রকাশ করেছেন। বৈষ্ণব সাধক রূপ, আনন্দ ও প্রেমের সাধনা করেন। আমরা দেহকে ভালবাসি, কারণ দেহ হচ্ছে রূপের আধার। কিন্তু বৈষ্ণব সাধক জানেন যে দেহ ভঙ্গুর—ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং তারা দেহাশ্রয়ী রূপের মাধ্যমে অরূপের বা শাশ্বত রূপের সন্ধান করতে থাকে। শাশ্বত রূপের সন্ধান করা মানেই বিমল আনন্দ লাভ করা। শাশ্বত রূপের অন্বেষণে প্রেমকে তারা একান্ত অপরিহার্য মনে করে। প্রেমার্ত অন্তর না হলে সে অপরূপের সঙ্গে মিলিত হওয়া যায় না। বৈষ্ণব কবির প্রেম-আকুলতা এজন্যই এত গভীর। কবি জ্ঞানদাস রচিত একটি পদে সেই আকুলতা অতি সুন্দর রূপে ধরা পড়েছে ঃ

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।
হিঁয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে
পরান পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

বৈষ্ণব কবিতা শাশ্বত রূপের পিয়াসী—অলৌকিক প্রেমের কাঙাল তা এখানে পরিষ্কাররূপে প্রতীয়মান হচ্ছে।

বৈষ্ণব কবিতার আর এক বিশেষত্ব এর পরকীয়া তত্ত্ব। যা সহজে পাওয়া যায় না তাকে পাওয়ার সাধনাই হচ্ছে পরকীয়া তত্ত্ব। এজন্যই দেখা যায় বৈষ্ণব কবিতায় কবিরা সব সময় বিরহ যাতনায় অস্থিরতা প্রকাশ করেছেন। পাওয়ার চেয়ে না পাওয়া—মিলনের চেয়ে বিরহের মধ্যেই তাদের বেশী সার্থকতা। পদাবলীতে দেখা যায় রাধা হয় অভিসারের প্রস্তুতি নিচ্ছে নয়তো শ্যামের বংশীধ্বনি শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে আছে। গোবিন্দদাস রচিত পরপৃষ্ঠার পদটিতে রাধার অভিসারের চিত্র অতি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

গাগর বারি ঢালি করা পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।
কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি॥
মাধব, তুয়া অভিসারক লাগি।
গুরুজন বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধি সম হাসই
গোবিন্দ দাস পরমাণ।।

কলসীর পানি ঢেলে চলার পথ পিচ্ছিল করা, পথে কাঁটা গেড়ে সে পথে চলতে গিয়ে কোমল পদযুগল ক্ষত-বিক্ষত করা ইত্যাকার কৃচ্ছ্র সাধনার মধ্য দিয়ে অভিসারের প্রস্তুতি নেয়ার মধ্যে এবং গুরুজন যারা তিরস্কৃত হয়েও রাধার মধ্যে যে মুগ্ধভাবা ফুটে উঠেছে তার মাঝেই রয়েছে আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া।

বৈষ্ণব পদাবলীর আদি লেখক হিসাবে জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যায়। তবে জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় ও বিদ্যাপতি মৈথিলী ভাষায় কাব্য রচনা করেছেন। চণ্ডীদাসই প্রথম বাংলা ভাষায় পদাবলী রচনা করেন। তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' বৈষ্ণব মরমী কবিতার অপূর্ব সংকলন। এই কবি প্রেমকে এমন এক উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন যা আর কোন কবির কাব্যে সচরাচর পরিলক্ষিত হয় না। তিনি সাধারণ মানবীয় প্রেমকে ঐশ্বরিক মহিমায় মণ্ডিত করেছেন। তাঁর কাব্যে রাধার যে ভাবমূর্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তা হচ্ছে বিশ্বের যত প্রেমার্ত চিত্তের প্রতীক। চণ্ডীদাসের পদে যে আধ্যাত্মিকতার পরিস্ফুটন ঘটেছে তা আমাদের মনকে গভীর ভাবাবেগে অভিভূত করে তোলে। কবির রাধা যখন বলেন ঃ

গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি
সদা ছল ছল আঁখি
পুলকে আকুল দিক নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি।

দাঁড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে
পুলকে পুরয় তনু শ্যাম পরসঙ্গে
পুলক ঢাকিতে……করি পরকার
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার।

তখন বেশ বোঝা যায় এই যে ‘সদা ছল ছল আঁখিতে সারা জগতকে ‘শ্যামময়’ দেখা এবং আনন্দে পুলকে অনিবার অশ্রু বরষণ-- এ বড় সহজ কথা নয়। এই সৌভাগ্যবতী নারী ধূলিলিপ্ত জগৎ থেকে সত্যি করেই অনেক উর্ধ্বে উঠে গেছে। যখন রাধা বলে “জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো” ইত্যাদি তখন স্পষ্ট বোঝা যায় ভক্তের প্রেমপূর্ণ চিত্ত ঈশ্বরচিন্তায় সমাহিতপ্রাণ হয়ে গেছে। জাগতিক অনুভূতি-রহিত রাধার মানবীয় প্রেম ঐশ্বরিক প্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে। চণ্ডীদাসের কাব্যের আধ্যাত্মিকতা ও মরমীস্বরূপ বর্ণনায় দীনেশ সেনের উক্তি সবিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত — “চণ্ডীদাসের মানুষী প্রেম ক্ষণে ক্ষণে এক উন্নত অমানুষী প্রেমরাজ্যের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রামীর কথা বলিতে যাইয়াও চণ্ডীদাস মানুষী প্রেমের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া আশ্চর্যরূপে পবিত্রতার সহিত ধর্মজগতের কথা কহিয়াছেন। ‘কাম গন্ধ নাহি তায়’ ‘তুমি যে মন্ত্র তুমি তন্ত্র, তুমি উপাসনা রস’— এগুলি ধর্মবেদী হইতে উচ্চারিত স্তোত্রের মত শুনায় ধোপানীর পায় যে পুষ্পাঞ্জলী— যে আদর ও শ্রদ্ধা পড়িয়াছে, তাহা যেন কোন অজানিত স্বর্গলোকে অলক্ষিতভাবে পৌঁছিয়া চিরপবিত্র হইয়া রহিয়াছে। তাহার সরল কথাগুলি বড়ই মর্মস্পর্শী। চণ্ডীদাস যে ধ্যানপরায়ণা রাধিকার মূর্তি দেখাইয়াছেন, তাহার সাশ্রুনেত্র আমাদিগকে স্বর্গীয় প্রেমের স্বপ্ন দেখাইয়া অনুসরণ করে এবং চৈতন্য প্রভুর দুইটি সজল চক্ষুর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সেই মূর্তি নির্মল অধ্যাত্মরাজ্য স্পর্শ করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছে।”

কবি চণ্ডীদাস বলেছেন ঃ

বধূ, তুমি যে আমার প্রাণ
দেহমন আদি তোঁহারে সঁপেছি
কুলশীল জাতিমান।
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ

বধূ, তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভালমন্দ নাহি জানি
কহে চণ্ডীদাস পাপপূণ্য মম
তোমার চরণ মানি ।।

কবি এই পদটিতে রাধার আত্মসমর্পণের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা দেখে মনে হয়, প্রেমের বেদীতে ঈশ্বরের উদ্দেশে মাথা নুইয়ে আছে এই উৎসর্গীকৃতপ্রাণা নারী। জীবনের ভালমন্দ, পাপ-পূণ্য সকল কিছু তার কাছে নিবেদন করে সে পরম নিশ্চিন্তা। জগতের কোন মালিন্যই তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। আধ্যাত্মিক জগতেই তার বিচরণ।

চণ্ডীদাসের পরে আমরা যেসব কবির কবিতা পেয়েছি তারা সবাই চৈতন্যদেবের সমসাময়িক—নয়তো তার পরবর্তী কালের। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্য এক নতুন রসচেতনার দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। সে রস হচ্ছে ভক্তি রস। প্রবাহিত প্রেমধারার সঙ্গে ভক্তিধারা মিলিত হয়ে এ সময়ে পদাবলী সাহিত্য এক নতুন রূপ লাভ করেছে। চৈতন্যদেবের জীবনলীলাকে কেন্দ্র করেই এই নতুনত্ব সঞ্চারিত হয়। চৈতন্য প্রভু নিজ অন্তরেই বৃন্দাবন লীলা প্রত্যক্ষ করতেন। এবং নিজেকে একই সঙ্গে কৃষ্ণ ও রাধা ভাবে ভাবিত করতেন। তাঁর পরবর্তী কালের কবিদের রচিত পদাবলীতে এই ধর্মতত্ত্বের ছাপ পড়েছে। প্রেমিক তার প্রেমাস্পদকে অন্তরে মিলিয়ে নিতে চায়—মিলিয়ে নিতে পারে। কিন্তু যে ভক্ত, সে তার আরাধ্যকে ঠিক অন্তরে মিলিয়ে নিতে পারে না। সে আরাধ্য দেবতাকে উঁচু আসনে বসিয়ে ভক্তি গদগদ চিত্তে পূজা করে। যদি ভক্ত একবারে না পায় তবে আবার প্রবৃত্ত হয় দুঃশ্চর সাধনায়। নিজের দীনতা স্বীকার করে। কিন্তু প্রেমিকজন প্রেমিককে না পেলে অভিমান করে—রাগ করে। চণ্ডীদাসের কবিতায় রাধা ও কৃষ্ণ প্রেমিক-প্রেমিকা। কিন্তু জ্ঞানদাসের প্রভৃতি চৈতন্য-পরবর্তী কবির কবিতায় রাধা ও কৃষ্ণের সম্পর্ক ভক্ত ও আরাধ্যের সম্পৃ
তাই জ্ঞানদাস যখন বলেন:

তোমার গরবে গরবিনী হাম
রূপসী তোমার রূপে

হেন মনে লয় ও দুটি চরণ
সদা লয়্যা রাখি বুকে
অন্যের আছয়ে অনেক জন
আমার কেবলি তুমি
পরান হইতে শত শত গুণে
প্রিয়তম করি মানি ।।

তখন চণ্ডীদাসের রাধা প্রেমিককে না পেয়ে, প্রতীক্ষায় অধৈর্য হয়ে শেষ পর্যন্ত অভিশাপ দিয়ে বসে ঃ

এ হেন বধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়।

প্রেম চিরকালই সন্দেহপরায়ণ। কৃষ্ণের আগমনে বিলম্ব হওয়ায় চণ্ডীদাসের রাধা সেই চিরাচরিত রীতিতেই সন্দেহ করে বসে যে নিশ্চয়ই কেউ তার প্রিয়তমকে কান ভাঙ্গানি দিয়েছে। সুতরাং নেপথ্যের সেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে অভিশাপ দিতে সে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হয় না।

মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে অনেক মুসলমান কবিও আছেন যাঁরা বৈষ্ণবভাবাপন্ন কবিতা রচনা করেছেন। এসব মুসলমান কবিরা যে বৈষ্ণব হয়ে গিয়েছিলেন—এমন নয়। পদাবলী রচয়িতা সকল হিন্দু কবি যেমন বৈষ্ণব ছিলেন না, তেমনি এসব মুসলিম কবিরাও বৈষ্ণব ছিলেন না। তাঁরা বৈষ্ণব পদ লিখেছেন মাত্র। তবে যা লিখেছেন সেগুলি গুণগত দিক দিয়ে হিন্দু কবিদের সমান মর্যাদা অনেক স্থলেই দাবী করতে পারে। আসল কথা—এঁরা যুগধর্মের প্রভাবকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। যুগে যুগে দেখা গেছে একেকটা ধর্মমত এমন এক সর্বগ্রাসী আলোড়ন সৃষ্টি করে যার ফলে তার সাম্প্রদায়িক রূপ তিরোহিত হয়ে সার্বজনীন রূপ বিকশিত হয়ে ওঠে। এবং সমগ্র জাতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। বাংলার সহজিয়া ধর্মমতেরও এই রকম একটা শক্তি ছিল। তাই দেখা যায় মধ্যযুগে বাংলার সকল কবিই জাতিধর্ম-নির্বিশেষে বৈষ্ণব কবিতা রচনা করেছেন। এর মধ্যে অনেকেই খাঁটি বৈষ্ণব অনুভূতি নিয়ে লিখেছেন। এগুলি বৈষ্ণব কবিতা রূপে প্রশংসা অর্জন করেছে। আবার কেউ কেউ

শুধু প্রথানুযায়ী কলম ধরেছেন। মুসলমান কবিরাও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। আসলে তখন যে-কোন প্রেম বিষয়ক কথা বলতে গেলেই রাধাকৃষ্ণের রূপক ব্যবহারের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। এজন্যই একজন সমালোচক বলেছেন—"শান্তিপুর ডুবুডুবু ন'দে ভেসে যায়।" কিম্বা "কানুছাড়া গীত নাই" ইত্যাদি। সত্যিই, মধ্যযুগে রাধাকৃষ্ণের প্রেম ও ভক্তির প্লাবনে দেশ এমনভাবে ভেসে গিয়েছিল যে সেই প্লাবন থেকে মুসলমান কবিরাও রক্ষা পাননি।

মুসলমান কবিদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সুফীভাবাপন্ন। আগেই বলেছি—বাংলাদেশে এক সময়ে সুফীধর্মও বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এবং কি কারণে সুফীধর্মের প্রসার ঘটে তাও বলা হয়েছে। দেশের সামাজিক বিপর্যয় থেকে জনগণকে রক্ষার জন্য এই সময় ইরান, পারস্য প্রভৃতি দেশ থেকে সূফী-দরবেশগণ বাংলাদেশে আগমন করেন। মুসলমান শাসনের শুরুতে এইসব সূফী দরবেশগণ জনগণের মানস সংস্কারের ব্রত গ্রহণ করেন। এঁরা দেশে ইসলামের সত্য ও সুন্দর বাণী প্রচারের দ্বারা জনগণকে ধর্মীয় অধঃপতন থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন। এঁদের দ্বারাই হাফিজ, রুমী, সাদী প্রমুখ সুফী কবিগণের প্রেমভাবাপন্ন গজল গান বাংলাদেশে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। এসব কবিরা ছিলেন প্রেমপন্থী সুফী কবি। সুফীধর্মে বলা হয় ঈশ্বর পরমাত্মা আর মানব হচ্ছে জীবাত্মা। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে রয়েছে প্রেমের সম্পর্ক। ঈশ্বর প্রেমাস্পদ, প্রেমের দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এই সৃষ্টিরহস্যের স্বাদ তো একা গ্রহণ করা যায় না। তার জন্য দরকার সঙ্গী বা দোসর। মানব বা জীবাত্মা হচ্ছে সেই দোসর বা সঙ্গী প্রেমিক। প্রেমাস্পদের সাথে মিলনেই জীবনের সার্থকতা। কিন্তু নানা বিপাকে পড়ে জীবাত্মা পরম প্রেমাস্পদকে ভুলে থাকে। মানবাত্মাকে এই বিস্মৃতি থেকে জেগে উঠতে হবে। নিজের পৃথক সত্তা ভুলে সেই প্রেমিকের সঙ্গে মিলনের জন্য সাধনা করতে হবে। সুতরাং শাশ্বত পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের জন্য জীবাত্মার আকুল প্রয়াসই হচ্ছে সুফীধর্মের মূল কথা। ওদিকে বৈষ্ণব সহজিয়া প্রেমধর্ম তো আগেই ছিল। কৃষ্ণ অখণ্ডচৈতন্য বা পরম প্রেমাস্পদ আর রাধা বিশ্ব প্রেমিকের প্রতীক। রাধার সকল আকুতি—সকল সাধনা সেই প্রেমস্পাদের সাথে মিলনের জন্যই। এই সহজিয়া প্রেমধর্ম আর সূফী প্রেমধর্ম বাংলার

মুসলমান কবিদের মধ্যে একটি সহজ সাধারণ সমন্বয় লাভ করেছে। তাই দেখা যায়, মুসলমান কবিরা প্রেমের কথা বলতে যেয়ে জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রেমলীলার কথাই বলেছেন এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে রাধাকৃষ্ণের রূপকে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের ভাবদৃষ্টিতে কৃষ্ণের জন্য রাধার আর্তি প্রেমাস্পদের জন্য বিশ্বের সকল প্রেমিকদের বিরহের আর্তি এক হয়ে গেছে। এরা রাধার স্থলে নিজেকেই ভাবিত করে পদ রচনা করেছেন। যেমন—

ছারাল যা ইরফানে কইন
বন্ধু আমার বংশীধারী
ওরে বাজাইয়া মোহন বাঁশী
আমার প্রাণী কৈল চুরি।

দীনেশ সেন মহাশয়ের দেওয়া বৈষ্ণব পদকর্তাদের তালিকায় এগারজন মুসলমান পদকর্তার নাম পাওয়া যায়। এদের মধ্যে কবি আফজাল সবচেয়ে পুরাতন। কবীর, চাঁদকাজি, আকবর, নাসির মাহমুদ, কবি হাবিব, কতন, শেখ জালাল শেখ লাল, সৈয়দ মুর্তজা, আরকুম, উমর, আলিরাজা, ইরফান, প্রমুখ প্রসিদ্ধ মুসলিম পদকর্তা। এসব কবিদের রচনা খাঁটি বৈষ্ণব কবিতা হয়েছে কিনা সে সম্বন্ধে তর্কের অবসর থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু এই কবিতাগুলির মরমী স্বরূপ সম্পর্কে তর্ক করবার কিছু নেই। কারণ এগুলি ভক্তিপ্লুত অন্তরের স্বভাবসিদ্ধ রচনা। যেমন:

মোরে কর দয়া দেহ পদছায়া
শুনহ পরান কানু
কুলশীলব সব ভাসাইনু জলে
প্রাণ না রহে তোমা বিনু……

এখানে কবি নিজেকে রাধা-স্থলে ভেবে কানু বা পরমাত্মার নৈকট্য ভিক্ষা করছেন। কবির আকুতিই এখানে প্রবল। এই ভাবটি কবি ছারাল আকবর আলির একটি পদেও লক্ষণীয়:

একা ঘরে শুইয়া থাকি
শুতিলে স্বপন দেখি
ও আমার কর্মদোষে না পাইলাম জাগিয়া
ছারাল আকবার আলী বলে
পীরিতে মোর অঙ্গ জলে
ও বন্ধে প্রাণে মাইল স্বপ্নে দেখা দিয়া।

কৃষ্ণ বা পরমাত্মার প্রেমে রাধারূপে কবি জ্বলে পুড়ে মরছেন। তাই এক জায়গায় তিনি প্রশ্ন করেন—

তোরে মিনয় করি চরণ ধরি বৈলা দে গো রাই
হৃদয়ের ধন রতন মণি কোথায় গেলে পাই ?

এ পদে বুঝতে একটুও অসুবিধা হয় না যে রাধার মর্মবেদনা ও কবির মর্মবেদনার স্বরূপ একই। তাই কবি রাধাকে সহমর্মী ভেবে তাকে জিজ্ঞেস করছেন হৃদয়ের পরম আকাঙ্ক্ষিত ধন কৃষ্ণকে কোথায় গেলে পাওয়া যাবে।

চট্টগ্রামের কবি আলি রাজার একটি পদে প্রেমানলে দগ্ধীভূত হৃদয়ের জ্বালা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে ঃ

শুন সখি সার কথা মোর
কুলবধূ প্রাণি হরে সে কেমন চোর।
সে নাগর চিত্তচোরা কালা যার নাম
জীতা রাখি প্রাণি হরে বড় চৌর্য কাম।
মোর জীউ সে কিমতে লই গেল হরি
শুন্য ঘরে প্রেমানলে পুড়ি আমি মরি
গুরুপদে আলিরাজা গাহে প্রেমধরে
প্রেম খেলে নানারূপে প্রতি ঘরে ঘরে।

কবি এখানে রসিক প্রেমিকের চৌর্যবৃত্তির কথা বলছেন। এ চৌর্যবৃত্তির ধরন আলাদা। মানুষ বেঁচেই থাকে কিন্তু তার প্রাণ হরণ করে নিয়ে যায় সেই চতুর কালা। কবির মতে জগতের সকল প্রেমিকের অন্তরই এভাবে অপহৃত হয়ে যায়। এর সত্যতা উপলব্ধি করতে হলে গুরুপদে আশ্রয় করে চিত্তবিশুদ্ধির দ্বারা সাধনায় ব্রতী হতে হবে। অনেক কবির রচনাতেই এই চিত্ত হারানোর বেদনা ধ্বনিত হয়েছে। কবি চণ্ডীদাসের নিম্ন পদটিতে বেদনার্ত চিত্তের মূর্তিমান রূপ দেখতে পাওয়া যায় নব অনুরাগিণী রাধার উদাসিনী মূর্তির মাঝে ঃ

আলো, রাধার কি হৈল অন্তরব্যথা
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে না শুনে কাহার কথা।
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ন তারা

বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমন যোগিনী পারা
এলাইয়া বেনী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি
হসিত বয়ানে চাহে মেঘ পানে
কি কহে দুহাত তুলি
একদিঠ করি ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরিক্ষণ
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বধুর সনে।।

কৃষ্ণপ্রেমে রাধা পাগলিনী প্রায়। জগৎ সংসার সম্বন্ধে তার জ্ঞান নেই। যোগিনী মূতি ধরে কোন্ ধেয়ানে যে থাকে তা সংসারী মানুষ বুঝতে পারে না। কিন্তু কবি পারেন। তাই তিনি বলেন—"নব পরিচয় কালিয়া বধুর সনে।" রাধার বৈরাগ্যের রহস্য তিনি ব্যক্ত করেন। এই ভাবের পরিচয় মুসলমান কবি শীতলাং শাহের একটি পদেও ফুটেছে—

ক্ষুধা নিদ্রা নাই তার মনে
জলধারা দুই নয়নে গো
এগো ছির যুরে প্রেমধুন্ধে
দিবানিশি ইন্তিজার
হাসিখুশি নাই তার মনে
সদায় থাকে ঘোর নয়নে গো
এগো লাজ ভয় নাই তার
কলঙ্ক তার অলঙ্কার।

এই যে লাজ-ভয় বিসর্জন দিয়ে কলঙ্ককে অলঙ্কার করেছে রাধা—এ রাধা পরম প্রেমিকা, প্রেমাস্পদের জন্য সর্বদাই উদাসিনী হয়ে থাকে। এ রাধা জগতের সকল প্রেমার্ত চিত্তের প্রতীক।

দেহের সাধনা সহজিয়া বৈষ্ণবদের পরম সাধনা। কারণ তারা মনে করে দেহই সকল বস্তু বা তত্ত্বের আকর। দেহের ভিতরকার শক্তিকে আয়ত্তে আনতে পারলেই সাধনায় সাফল্য আসবে। কারণ এই শক্তির দ্বারাই পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভ করা যাবে। দেহই সকল তত্ত্বের আধার.

সুতরাং দেহ সাধনা করা প্রয়োজন—একথা আমরা চর্যাকারদের রচনাতেও বার বার দেখেছি, আবার সুফী ভাবাপন্ন মুসলিম কবিদের রচনাতেও দেখা যায় এই বিশ্বাসেরই স্ফুরণ। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বণনায় এসব কবিরা বৈষ্ণবদের এই তত্ত্বকেই সত্যরূপে গ্রহণ করেছেন। তাই বৈষ্ণব কবি যেমন বলেন ঃ

তোরি বুকের ভিতর অতল সাগর
তার না পাইলি মরম
তার নাই কুলকিনারা শাস্ত্র ধারা
নাই ধরম কি মরম।

অর্থাৎ পরম রহস্যের খনি লুকানো রয়েছে এই দেহেরই ভিতরে। সেই খনির অতল রহস্য আবিষ্কার করাই জীবনের সাধনা। এ ছাড়া প্রেমিকের জীবনে ধর্মকর্ম বলে আর কি থাকতে পারে? তেমনি সুফী কবিও বলেন ঃ

সই সই কি মোর নিশি কি মোর দিশি
কি মোর এ রবি শশী
ঘরের সোয়ামী হাসিয়া ন বোলাএ
মুঞি অপরাধী দোষী।
সই সই না জানি কি দোষে পিয়া মোরে রোষে
নিদআ হৃদয়ে পিউ
কহে সিরতাজে সোআমী উদ্দেশে
সহজে তেজীমু জীউ।

অর্থাৎ দিনই কি আর রাত্রিই কি? ঘরের 'সোআমী' (ঘরের মালিক) যদি সদয় হয়ে কৃপা বর্ষণ না করে তবে উজ্জ্বল সূর্যালোকেই বা কি আসে যায় আর শশীর নম্র কিরণ ধারাই বা কোন্ সান্ত্বনা দিতে পারে? অন্তরে রয়েছে কৃষ্ণ বা পরম স্বরূপ। তাকে পেলেই তো জীবন সার্থক। তাকে পাওয়ার জন্য কবি অনায়াসে জীউ বা জীবন বিসর্জন দিতে পারেন।

কৃষ্ণ বা পরম স্বরূপ অনন্ত প্রেমময়! নিজের প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করার জন্যই তো সৃষ্টি করেছেন জীবাত্মা। পরমাত্মা পরিপূর্ণ। তিনি কখনও জীবাত্মাকে ভোলেন না। কিন্তু জীবাত্মা সংসারের সকল বন্ধনের মধ্যে তাকে ভুলে থাকে। তবে এটা তার জানা আছে যে পরমাত্মার সঙ্গে

তার প্রেমের সম্পর্ক। সুতরাং সহসা যখন সেই প্রেমাস্পদের জন্য বিরহ বেদনা জেগে ওঠে তখনই সে সকল বাধা তুচ্ছ করে তাকে পাওয়ার জন্য ছুটে বেরিয়ে পড়ে তখন সংসার থেকে কত বাধা, কত গঞ্জনা, কত নীতিবোধ, কত ধিক্কার পথ রোধ করে দাঁড়ায়। কিন্তু বিস্মৃতি যার টুটে গেছে—প্রেমের পথে পা বাড়িয়ে কোন কারণেই সে আর পেছন ফিরতে পারে না। পথের প্রতিকুলতাও তাকে থামিয়ে রাখতে পারে না। তাই তো কবি উম্মর বলেন—

আমি তোমার লাগি হইলাম ঘরের বার
প্রেম সাগরে ধইলাম গো পাড়ি না জানি সাঁতার
উম্মর পাগলে কয় শুনছি তুমি দয়াময় গো
ওগো দিয়া তরী শীঘ্র করি এখন মোরে কর পার।
আমি তোমার লাগি হইলাম ঘরের বার।

এই যে প্রেমাস্পদের জন্য ঘরের বার হয়ে আসা তার জন্য সাধনার কঠোর কুটিল পথে পদচারণা, এটা জীবনের প্রথম থেকেই করা উচিত। কারণ প্রেমে সিদ্ধিলাভ করা বড় সহজ ব্যাপার নয়—এর জন্য দরকার জীবনব্যাপী সাধনা। প্রেমাস্পদকে যদি অত অল্পেতেই পাওয়া যেতো তবে আর জগতব্যাপী এত বিরহের আর্তনাদ ধ্বনিত হতো না। দেখা যায় দীর্ঘকাল সাধনা করেও অনেক হতভাগ্য সাধক পরম স্বরূপকে হৃদয়ে ধরতে পারেন নাই কিম্বা পেলেও মুহূর্তের 'দরশন' দিয়েই বিরহের জ্বালা শতগুণ বাড়িয়ে দিয়ে অন্তর্হিত হয়েছেন। আরকুম কবি রচিত একটি পদে এই উক্তির সমর্থন মেলে। যেমন—

পাগল আরকুমে বলে
শিশুকালে প্রেম না করিলে
না আসিব প্রাণবন্দ রাত্রি নিশাকালে।

সত্যিই তো সময় থাকতেই সাধনার পথে অগ্রসর না হলে সিদ্ধিলাভ সম্ভব হবে কি করে? আমাদের বিরহ-ব্যাকুল তৃষিত আত্মার ক্রন্দন থামবে তখনই যখন পাবে 'প্রাণবন্ধু' বা পরমাত্মার নৈকট্য। তাই তাকে পাওয়ার জন্য জীবনের প্রথম থেকেই তপস্যার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করে অন্তরকে প্রেমপূর্ণ করে তুলতে হবে। তবেই জীবন সন্ধ্যায় ঈশ্বর সম্মিলনের আনন্দে হৃদয়ে সার্থকতা আসবে। সুতরাং অকাজে কুকাজে বৃথা সময় ব্যয় না করে আগেই সচেতন হওয়া উচিত।

এইসব পদে কবিরা নিজেকে রাধার স্থানে বসিয়ে নিজের আর্তিকেই রাধার আর্তিরূপে প্রকাশ করেছেন। পরমেশ্বরের জন্য কবির আর্তিই আসলে কৃষ্ণের জন্য রাধার আর্তি। কোন কোন সূফীভাবাপন্ন মুসলিম কবি ইসলামী পদাবলী রচনা করেছেন। স্পষ্ট বোঝা যায় যুগধর্মকে অস্বীকার করতে পারেননি বলেই পদাবলী রচনা করেছেন। যেটা কেবল গতানুগতিক রীতিকে বহিরঙ্গের দিক দিয়ে অনুসরণ করা ছাড়া আর কিছু নয়। এসব রচনায় রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ নেই। বিখ্যাত পীর ও কবি শাহ সুলতানের মুরীদ কবি ফতেখানের একটি পদে এ উক্তির সমর্থন মেলে। তিনি লিখেছেন—

প্রাণ সই কি কহব হাম হতভাগী
দুঃসহ মদন শরে দহে মোরে নিরন্তরে
উঠি বসি নিশি রঁহো জাগি।

এখানে 'মদন শরে' দগ্ধীভূত প্রাণ কবি আসলে ঈশ্বর প্রেমেই জর্জরিত। মধ্যযুগের কবি দৌলত কাজী ছিলেন সূফী সাধক। তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম মুসলমান কবি। তিনি "সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী" নামে যে কাব্যখানা রচনা করেছেন তার স্থানে স্থানেও বৈষ্ণব পদাবলীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বৈষ্ণব পদাবলী বাঙালীর জাতীয় মানসকে যে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল তার বহু প্রমাণ রয়েছে। কবি আলাওল ছিলেন বিজ্ঞ ধার্মিক ও পণ্ডিত ব্যক্তি। অথচ তিনিও বহু পদ রচনা করেছেন। তাঁর একটি পদ—

হারে বন্ধুর বাঁশী বিষম ফাঁসি
লাগিয়া রইল রাধার গলে।।
বন্ধুর বাঁশী চিত্তচোর লাগাইয়া প্রেমের ডোর
যুবতীর মন ধরি টানে
কুলবধূ কুল হিয়া হরি নিল বাঁশী দিয়া
প্রাণ নিল বুঝি অনুমানে।
তুই বন্ধুর কঠিন হিয়া অনলেতে কাঠ দিয়া
ছাই হই জলিয়া পুড়িয়া
কহে হীন আলাওলে জল ঢাল সে অনলে
নিবাও অনল প্রেমরাগ দিয়া।।

হয়তো গতানুগতিক ধারাকেই অনুসরণ করেছিলেন আলাওল। কিন্তু লিখতে বসে যে তিনি রাধাচিত্তের সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কৃষ্ণপ্রেমে জর্জরিতা রাধার অন্তর-বেদনা প্রকাশ করতে যেয়ে কবি যেন নিজেরই বিরহানলে দগ্ধীভূত হৃদয়কে তুলে ধরেছেন পাঠকের সম্মুখে। প্রেমরাগ ছাড়া অন্তরের সে আগুন নিভবে না। এ হৃদয় ঈশ্বরপ্রেমে আসক্ত হৃদয়। তাছাড়া আলাওল ছিলেন সত্যিকারের বিদগ্ধ রসিক চিত্তের অধিকারী। তাই রাধাকৃষ্ণের ভক্ত না হয়েও যে সব বৈষ্ণবপদ রচনা করেছেন তার মধ্যে তাঁর সৌন্দর্যবোধ ও ভক্তরসের পরিচয় ফুটে উঠেছে। নিম্নোক্ত পদটিতে তাঁর বিরহী মনের আক্ষেপ ঝরে পড়েছে :

আহা মোর বিদরে পরাণ
জাগিতে স্বপন দেখি ভূমে নাহি আন ॥
কি জানি লিখিছে বিধি এ পাপ করমে
পাইয়া পরশমণি হাঁরাইলু ভ্রমে।
সে সব মনের দুঃখ কাহাকে কহিব।
ব্যথিত বান্ধবকুল স্মরিতে মরিব।
যুগের অধিক যায় দুঃখে নিশিদিন
কেমনে সহিব প্রাণে জলহীন মীন।
কি লাগি দারুণ জীউ আছে মোর ঘটে।
কঠিন পাষাণ হিয়া এ দুখে না ফাটে।
মহন্ত সৈয়দ মুসা জানেত কুশল
বিরহ বেদনা গাহে হীন আলাওল।

পরশমণি পেয়ে হারানোর মত যাতনা বুঝি আর নেই। ভক্ত যদি আরাধ্যকে পেয়েও আবার কোন পাপের ফলে তাকে হারায় কিম্বা সিদ্ধিলাভ করেও সিদ্ধিভ্রষ্ট হয় তবে সে দুঃখ কোথায়ই বা রাখা যায়? এমনিতরো বেদনার আর্তনাদই আলাওলের ঈশ্বর-প্রেমের তীব্রতা প্রকাশ করছে।

শেখ কবীর পদকর্তা হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কবি সৈয়দ মর্তুজাও অনেকগুলি পদ রচনা করেছেন। সহজ সরল ভাষায় রচিত এই পদগুলির ভাব-মাধুর্য অতি উচ্চস্তরের। তার অনেকগুলি পদ

বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। একটি পদ "পদ-কল্প-তরু'তে স্থান পেয়েছে। প্রেমাস্পদের প্রতি আত্মনিবেদনমূলক পদগুলির ভাব খুবই মর্ম্মস্পর্শী।

মোট কথা পদাবলী এক অপূর্ব প্রেম সঙ্গীত। বাংলা মরমী গীতি কবিতার যে ধারাটির উৎসমুখ খুলে গিয়েছিল চর্যাপদে, সেই ধারাই শত-ধারে প্রবাহিত হয়ে সারা বাংলাদেশের জনমানসকে প্লাবিত করে দিয়েছিল।

২

বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে একটি বিষয় লক্ষণীয়। সে হচ্ছে এর দুঃখবাদী সুর। পদকর্ত্তা হিন্দুই হোন আর মুসলমানই হোন—তাদের পদে একটা গভীর দুঃখের সুর অনুরণিত হয়েছে। এর একটা কারণ হবে প্রকৃতির প্রভাবজনিত। কারণ বাংলার প্রকৃতির মধ্যে এমন এক উদাস ভাব ছড়িয়ে রয়েছে যার প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া প্রেমিক কবিকুলের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই সুখের মধ্যেও তারা দুঃখকেই বড় করে দেখেছেন। তাছাড়া আরো একটি কারণ আছে এবং মনে হয় সেইটিই যথার্থ। প্রেমিক মানেই ভাবুক। প্রেমদৃষ্টি যে লাভ করেছে স্বভাবতঃই সে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে ভাবনাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু তাতে সে কী পায়? জীবনের ক্ষণিকতা সম্বন্ধে বোধ যখন জাগ্রত হয়—জগতের নশ্বরতা সম্বন্ধে যখন স্থির বিশ্বাস জন্মে, তখন এক গভীর দুঃখবোধ তাকে ঘিরে ধরে। জগৎ সংসারে দেখতে পায় বেদনার অঞ্জন মাখানো। এই বেদনাজাল ছিন্ন করে অমৃতলোকে যাওয়ার বাসনা জাগে অন্তরে। অবিনশ্বরকে পাওয়ার জন্য, তার সঙ্গে মিলিত হয়ে সকল দুঃখ ভুলবার জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করে। কিন্তু সে পথ তো বড় সহজ নয়। প্রেমের পথ কণ্টকময়—সাধনার পথ বড় দুরূহ। একদিকে সকল বন্ধন কেটে বেরিয়ে যাওয়ার বেদনা, অন্য দিকে পাই কি না পাই, এই বুঝি পেলাম কিম্বা পেয়ে হারানো ইত্যাকার সহস্র ভাবনায় মন বেদনার্ত হয়ে পড়ে। কাজেই কবিদের রচনায় সব সময়ই একটা দুঃখবাদ ছায়া ফেলে রেখেছে। তবে বৈষ্ণব কবিরা মিলনের চেয়ে বিরহের মাঝেই বেশী

সার্থকতা অনুভব করেন। তাই সুখের চেয়ে দুঃখের ডালি বইতেই তাদের বেশী আনন্দ। আধ্যাত্মিক পিপাসা মানুষের চিরন্তন। এ পিপাসার নিবৃত্তি নেই ; কাজেই দুঃখেরও শেষ নেই।

বৈষ্ণব পদাবলী সাধারণতঃ গাইবার উদ্দেশ্যেই রচিত। কীর্তনের আসরে যখন সুরতাল যোগে ভক্তিপ্লুত চিত্তে গাওয়া হয় তখন আসরের সকল শ্রোতা ও গায়ক পরম আবেশে কি এক অপ্রাকৃত অনুভূতিতে অভিভূত হয়ে পড়ে। সমালোচকগণ চণ্ডীদাসের কোন কোন পদকে ধ্যানের মন্ত্রই বলেছেন। এসব স্থানে কৃষ্ণের কাছে রাধার আত্মসমর্পণ যেন অসীমের মধ্যে সীমার বিলীন হয়ে যাওয়া। সত্যি, চণ্ডীদাসের ভক্তিপ্লুত প্রেম মরজগতের আঙ্গিনায় বসেই অমৃতলোক থেকে ঐশ্বরিক প্রেমের অমল নির্যাস বয়ে এনেছে। শুধু চণ্ডীদাস কেন? অপরাপর কবিদের রচনায়ও যে ভাবসম্পুদ ও অকৃত্রিম আর্তির পরিচয় বিধৃত রয়েছে তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় কবিরা জীবনব্যাপী সাধনা ও ধ্যান-তন্ময়তার দ্বারা জগৎ ও জীবনের সকল রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। তাদের যে বিরহের কান্না—তা উত্থিত হয়েছে ধূলিমাখা পৃথিবীরই বক্ষ থেকে এবং ছাড়িয়ে গেছে অসীম আকাশে কোন অমৃতলোকের সন্ধানে।

বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে পাঠকমাত্রেরই চোখে পড়বে "বাঁশী" শব্দটির। নানাভাবে নানা সুরে এর সঙ্গে পরিচয় ঘটবে পাঠকের। রাধা বংশীধ্বনি শোনার জন্ত উৎকর্ণ হয়ে থাকে। কৃষ্ণ যখন বাঁশী বাজিয়ে সংকেত জানায়, রাধা ব্যাকুল হয়ে ওঠে প্রিয় সন্নিধানে যাবার জন্য। কবি চণ্ডিদাস বলেছেন, "কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ে কালিনী নই কূলে।" এই কালিনী নদীটি কোথায়? হতে পারে বৃন্দাবন ভূমিতে প্রবাহিত যমুনারই অপর নাম কালিনী। কিন্তু আমাদের মনে হয় এ নদী স্বর্গের উদ্যান ঘেঁষে প্রবাহিত। সেই নদীর কূলে দাঁড়িয়ে এক জ্যোতির্ময় বাঁশীওয়ালা তাঁর অপূর্ব বাঁশীতে এক সুরের যাদু সৃষ্টি করে চলেছেন। আর জগতের যত মুগ্ধ আত্মা সেই উদাস সুরের টানে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে আঁকুপাঁকু করছে। এই জ্যোতির্ময় বাঁশীওয়ালা আর কেউ নন—স্বয়ং ঈশ্বর বা পরমাত্মা। পরমাত্মার বাঁশীতে মিলনের আহ্বান। সেই আহ্বানে সাড়া না দিয়ে কি কেউ পারে? বিশেষ করে প্রেমিক

চিত্ত! তাই তো যুগে যুগে যত কবিকুল দেখিয়েছেন রাধা প্রেম-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে বাঁশীর সুরে মন্ত্রমুগ্ধের মত ছুটে চলেছে সীমার বাধা কেটে। এ রাধা জীবাত্মার প্রতীক। পথ যত দুস্তর মিলনের আকাঙ্ক্ষা তত ঐকান্তিক; পরিবেশ যত প্রতিকূল, সাধনা তত ব্যাপক। বৈষ্ণব পদাবলীর স্বরূপ উদঘাটন করতে যেয়ে তাই তো রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"অপূর্ণ মানুষের পূর্ণের মধ্যে বিলীন করে দেওয়ার যে ক্ষুধা তা সর্বগ্রাসী; তাই তার উদ্দেশ্যে মানুষের চলা, কঠিন হতে কঠিনতরো পথে তার সাধনা। কিন্তু যার জন্য তার এ সাধনা, তিনি পূর্ণ—পরম সৌন্দর্যের আকর। তিনি অপেক্ষা করে আছেন সৌন্দর্যলোকে। পূর্ণের সাধনা নেই— সে একা। কেবল ধ্বনিত হচ্ছে তার প্রতীক্ষার বাঁশী। আর অপূর্ণ সকল কাঁটা তুচ্ছ করে যাত্রা করছে। বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা— দুইয়ে মিলে সৃষ্টি হচ্ছে এক অপূর্ব ঐক্যতান।"

॥ ৫ ॥

মধ্যযুগের মুসলিম কবি-মানস ও সূফী প্রভাব

মধ্যযুগে যেসব সাহিত্য রচিত হয়েছে তা প্রায় সবই ধর্মনির্ভর। ধর্মকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুকে সাহিত্যের উপজীব্য করা যায় এ কল্পনার সাহসও তখনকার দিনে কারো ছিল না। তাই স্বাভাবিক ভাবেই হিন্দু কবিরা যেমন দেবদেবী মন্ত্র-তন্ত্র যোগ-শাস্ত্র নিয়ে কাব্য রচনা করছিলেন, তেমনি মুসলমান কবিরাও নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যে যা কিছু মহৎ পেলেন তাই নিয়েই কাব্য রচনা করতে লাগলেন। এমনি করেই নবীবংশ, রসুল বিজয়, কাসাসোল আম্বিয়া প্রভৃতি ইসলামের নীতিকথা ও দৈনন্দিন জীবনের বিধি-নিষেধ বিষয়ক অনেক কাব্য রচিত হয়েছে। ধর্মের গণ্ডীতে থেকে সাহিত্য চর্চা করতে হয়েছে বলে সবার রচনাতেই আধ্যাত্মিক চেতনা সুপরিস্ফুট হয়েছে। এই আধ্যাত্মিক চেতনা অনেকটাই সূফীপ্রভাবজাত। কারণ এদেশে মধ্য এশিয়া থেকে আগত পীর, দরবেশ, ওলি-আল্লাহ প্রভৃতি সূফীসাধকদের দ্বারাই ইসলাম প্রচার লাভ করে। মুসলমানদেরকে ধর্মীয় ও সামাজিক অধঃপতন থেকে উদ্ধারের জন্য এসব মহাপুরুষেরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন। কল্যাণ ব্রতে উৎসর্গীকৃত প্রাণ এই সূফীসাধকদের জীবনাদর্শ মানুষকে বিস্মিত করেছে— মুগ্ধ করেছে, করেছে অনুপ্রাণিত। দলে দলে মানুষ দীক্ষা গ্রহণ করেছে। গড়ে উঠেছে ভক্ত সম্প্রদায়। সাধনার দ্বারা যে আধ্যাত্মিক সম্পদ তারা লাভ করেছেন, সমাজ মানসে পড়েছে তার ব্যাপক প্রভাব। এভাবেই গড়ে উঠেছে বাংলার আধ্যাত্ম সাধনার ভিত্তিভূমি। আর এই কারণেই তৎকালীন মুসলিম কবিদের রচনায় পড়েছে সূফীতত্ত্ব সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণার ব্যাপক প্রভাব। এই জাতীয় রচনাগুলি আমাদের মরমী সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ।

মধ্যযুগের মুসলিম কবিরা প্রায়ই ছিলেন সুফীভাবাপন্ন। তৎকালীন সমাজে বৈষ্ণব পদ রচনার যে হিড়িক পড়েছিল তা থেকে মুসলিম কবিরাও বাদ পড়েননি একথা আগেই বলা হয়েছে। কেউ পদাবলী রচনা করেছেন ভক্তিবশেই আবার কেউ কেউ নিছক গতানুগতিক প্রথায় পদ রচনা করেছেন। তারা পদে রাধাকৃষ্ণের যে রূপক ব্যবহার করেছেন আসলে তা সুফী তত্ত্বের জীবাত্মা পরমাত্মা বা আশেক-মাশুকের স্বরূপ বোঝাতেই। এ সম্বন্ধে পূর্বাহ্নেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই আবার বলতে গেলে দ্বিরুক্তিসঞ্জাত বিরক্তি উৎপাদন হবে মাত্র। সুতরাং মুসলমান কবিরা বৈষ্ণব পদ ছাড়া আর যা রচনা করেছেন সেই সম্বন্ধেই বলবো। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি সৈয়দ সুলতান ছিলেন সুফীভাবাপন্ন কবি। তিনি কতকগুলি পদ ও মারফতী গান রচনা করেছেন। সেগুলির কিছু কিছু 'রাগ মালা' বা 'গান সংগ্রহে' রক্ষিত আছে।

এ যুগের আরো একজন কবির পরিচয় আমরা পাই যিনি আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ, ধর্মভিত্তিক সাহিত্য রচনা করেছেন। ইনি শেখ চান্দ—সিলেটের অধিবাসী। তিনি ছিলেন পীরের শিষ্য। পীরের প্রদর্শিত পথেই তাঁর সাহিত্য ও অধ্যাত্ম সাধনা চলেছে। রসুল বিজয়, কিয়ামতনামা, হরগৌরী সংবাদ, তালিব নামা, প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর রচিত। এসব গ্রন্থে সুফী তত্ত্বের পরিচয় বিধৃত রয়েছে। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকেই এই তত্ত্বদর্শী কবির অধ্যাত্ম সাধনার পরিচয় উপলব্ধি করা যাবে—

মারুফত আর কিছু শুন দিয়া মন।
মন মত বুলি যারে মন কোন জন।
পোবনে বোহএ দম আতসে দে উম।
মিত্তিকাএ বৈসে মন জলে দে কুম।
আব বাতাস খাক বাদ এহি চারি জন।
চারি চিজে খেলা করে রসবান মন।
শূন্যে দিয়া উঠে খেলে শূন্যে কার মন।
মুখ মৈধ্যে কোন সমে পদকে নয়ন।
নাসাতে মক্কাতে খেনে খেনেক দিলেত।
কোনখানে জাএ মন পাতাল পুরেত।

ইত্যাদি।

কবি সৈয়দ মর্তুজা পদাবলী ছাড়াও 'যোগকলন্দর' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই গ্রন্থখানা বাংলার সূফীজগতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এ ছাড়া কবি সৈয়দ সুলতানের 'জ্ঞান প্রদীপ' ও 'জ্ঞান চৌতিশা' হাজী মুহম্মদের 'নূর জামাল', মীর মুহম্মদ শফীর 'নূর নামা', আবদুল হাকীমের 'চারি মোকাম ভেদ', শিহাবুদ্দীনের 'পীর নামা', আলি রাজার 'আগম সাগর', বালক ফকিরের 'জ্ঞান চৌতিশা', নিয়াজের 'যোগকলন্দর', মহসিন আলীর 'মোকাম মঞ্জিল কথা', শেখ মনসুরের 'শিরনামা', শেখ জাহিদের 'আত্ম পরিচয়', শেখ জেবুর 'আগম', রমজান আলীর 'আত্মব্যক্ত', রহিমউল্লার 'তন্ তেলাওত' ও শিহাজুল্লার 'যুগীকাঁচ' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এইসব গ্রন্থের কতকগুলিতে হিন্দু ও বৌদ্ধ পরিভাষা ও তত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে। আগম, জ্ঞান সাগর, জ্ঞান চৌতিশা প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তার প্রমাণ। আবার কতকগুলি গ্রন্থে—যেমন পীরনামা, মোকাম মঞ্জিল কথা, 'তন তেলাওত' প্রভৃতি গ্রন্থে ইসলামী পরিভাষার আবরণে সূফীতত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে। তবে দুই শ্রেণীর গ্রন্থই তত্ত্বমূলক। বাংলার মরমী সাহিত্যে এই গ্রন্থগুলির একটি উল্লেখযোগ্য স্থান রয়েছে।

১

গতানুগতিক স্রোতে গা ভাসালেও মুসলমান কবিরাই আবার সাহিত্য ক্ষেত্রে নতুন বৈচিত্র্য আমদানী করলেন। ধর্মনির্ভর সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে তারা মানবীয় আবেদনপূর্ণ রোমাণ্টিক প্রেমকাহিনী রচনা করতে লাগলেন। এগুলি সাধারণতঃ অনুবাদ। আরবী, ফারসী, হিন্দী প্রভৃতি ভাষা থেকে এসব প্রেম কাহিনীকে সাহিত্যের চমৎকার উপাদান হিসেবে গ্রহণ করলেন। তারা রচনা করলেন ইউসুফ জোলায়খা, শিরি-ফরহাদ, লায়লী-মজনু, পদ্মাবতী প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থ। এগুলি ইসলামের ইতিহাস, ধর্ম ও কিম্বদন্তীর সাথে জড়িত। সে যুগের ধর্ম ভিত্তিক সাহিত্যের মধ্যে এসব ব্যতিক্রমী কাব্যগুলি যে কেবল রোমাণ্টিক প্রেমকাহিনী বলেই মানুষের চিত্তকে আকর্ষণ করেছে তা নয়। নেপথ্যে আরো একটি কারণ রয়েছে আর তা হচ্ছে এর মরমী আবেদন। মুসলমান কবিরা এই যে রোমাণ্টিক কাব্যগুলি রচনা করেছেন এর মধ্যেও মানবীয় ধ্যান-ধারণাকে ঐশ্বরিক উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত করে দেখা হয়েছে। তার কারণ

কবিরা সূফী প্রভাবকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। সূফীদের ধ্যান-ধারণা ও আদর্শের দ্বারা এরা যে অনেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং তারা সাধারণ মানবীয় প্রেম বর্ণনাকেও ঈশ্বরপ্রেমের রূপক হিসেবে কল্পনা করেছেন। প্রেমিক প্রেমিকার মিলনকে কেন্দ্র করে যেসব কাহিনীকাব্য রচিত হয়েছে এসব সূফী মতানুসারী কবিরা তাকে আধ্যাত্মিক রূপক বলেই মনে করেন। তারা নায়ক-নায়িকার মধ্যে প্রেমের যে বিকাশ দেখিয়েছেন—যে প্রেম এক দুর্নিবার শক্তিস্বরূপ—যার দ্বারা পথের সকল বাঁধা-ব্যবধান অতিক্রম করে প্রিয় সন্নিধানে পৌঁছানো যায়। শিরি-ফরহাদ, লায়লী-মজনু প্রভৃতি কাব্য রূপককাব্য হিসেবেই পাঠক সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত।

এ যুগের মুসলিম কবিদের রচনা কিভাবে আমাদের মরমী সাহিত্যকে পুষ্ট করেছে, তা একে একে আলোচনা করলেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

২

মধ্যযুগের কবি শাহ মুহম্মদ সগীর রচনা করেন 'ইউসুফ জোলায়খা'। এখানি অনুবাদ কাব্য। বাঙালী মুসলমানদেরকে দেশীয় ভাষায় ধর্মীয় উপাখ্যান শোনানোর জন্যই তিনি এ কাব্য রচনা করেন। কিন্তু কোরআন ও বাইবেলে বর্ণিত গল্পের কাঠামো নিয়ে রচিত এ কাব্যগ্রন্থেই মানুষের চিরন্তন রূপ-পিপাসার কথাই প্রবল হয়েছে। গ্রন্থে ইউসুফ ও জোলায়খার মধ্যে পরস্পরের প্রতি যে আকর্ষণ দেখানো হয়েছে তা হচ্ছে জগতের সমস্ত ধূলিমলিনতার উর্ধ্বে এক অতীন্দ্রিয় রূপের জন্য আত্মার ক্রন্দন—সে এমন এক রূপ যার লয় নেই ধ্বংস নেই।

চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত প্রদেশ আরাকানের মগ রাজাদের রাজসভায় সাহিত্য চর্চা করেন কবি দৌলত কাজী। তিনি সাধন নামক হিন্দী কবি রচিত 'মৈনাসত' গ্রন্থ অবলম্বনে "সতীময়না ও লোর চন্দ্রানী" কাব্য রচনা করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ কবি এ কাব্য শেষ করে যেতে পারেননি। কিন্তু এই অসমাপ্ত কাব্যের মধ্যেই তাঁর ভাষার মাধুর্য ও উপমার সাহায্যে ভাব প্রকাশের যে ক্ষমতা দেখা যায় তা বিস্ময়কর। এখানেও মানবীয় প্রেম অতীন্দ্রিয় প্রেমের দ্যোতনা প্রকাশ করেছে। তাঁর রচনায় স্থানে স্থানে বৈষ্ণব-পদমাধুর্য ও ভাবগভীরতা ফুটে উঠেছে। তিনি কতকগুলি বৈষ্ণবপদও রচনা করেছেন।

মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে সৈয়দ আলাওল ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুপণ্ডিত। তিনি কবি জায়সী রচিত ফারসী কাব্য 'পদুমাবৎ' অবলম্বনে 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনা করেন। জায়সীকে তিনি পুরোপুরি অনুসরণ করেননি। তার অনেক অংশ বাদ দিয়ে তিনি নিজ কল্পিত আখ্যান জুড়ে দিয়েছেন। সিংহলের রাজকুমারী পদ্মাবতী ও চিতোরের রাজা রত্নসেনের প্রেমকাহিনী বিধৃত এই কাব্যে নরনারীর প্রেমই প্রধান উপজীব্য। কিন্তু প্রেমের যে স্বরূপ তাতে দেখানো হয়েছে তার ঐকান্তিকতা সুফীজগতের ভক্ত ও ঈশ্বরের প্রেম সম্পর্কের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানি রূপককাব্য হিসেবে বিশেষ সমাদৃত। এই জাতীয় রূপককাব্যের মধ্যে "লায়লী মজনু" একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। শুধু আমাদের দেশেই নয়—পৃথিবীর প্রায় সব ভাষার সাহিত্যেই 'লায়লী মজনু'র কাহিনী সুবিদিত। একাধিক ইরানী কবি ফারসী ভাষায় এ কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করেন। আমরা সেই ফারসী থেকেই লায়লী-মজনুর কাহিনী পেয়েছি। কারণ আমাদের দেশেও একসময় ব্যাপক ফার্সী চর্চা হোত। আমাদের অনেক কবিই ফারসী জানতেন।

ফারসী কবি জামীর 'লায়লী মজনু' থেকেই দৌলত উজির বাহরাম খান বাংলা ভাষায় 'লায়লী মজনু' রচনা করেন। তবে এটা হুবহু অনুবাদ নয়—ভাবানুবাদ। এর মধ্যে এমন এক প্রেমকাহিনী বর্ণিত হয়েছে যার আগুনে কেবল দেহমন তিলে তিলে পুড়ে খাক হয়। এ প্রেম সাধকের সাধনা তাপসের দুঃশ্বর তপস্যা। মজনু প্রেমিক। লায়লীর প্রেমে সে দিওয়ানা। লায়লীর নাম লায়লীর ধ্যান ছাড়া সে আর কিছু বোঝে না। সুফী দর্শন মতে লায়লী-মজনুর এই প্রেম হচ্ছে ঐশ্বরিক প্রেমের রূপক। বাহরাম খান মানবিক প্রেমকাহিনী হিসেবে রচনা করলেও এর মধ্যে যে মরমী আবেদন রয়েছে তা চিরকাল আধ্যাত্মিক রসপিপাসু মনের খোরাক জোগাবে। বইটিতে কবি দ্বৈত ভূমিকা পালন করেছেন। সে যুগে ধর্মের আওতায় থেকে দেবদেবী-নির্ভর কাহিনী শুনতে শুনতে পাঠকের রুচিতে যে একঘেয়েমী এসে গিয়েছিল সেটা তিনি দূর করলেন লায়লী মজনুর মত রোমাণ্টিক প্রেমকাহিনী রচনা করে। আবার এই প্রেমই যে কিভাবে শাশ্বত অবিনশ্বর প্রেমে রূপান্তরিত হয়ে চিরকালের মরমী রস-পিপাসু মনের তৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম তাও তিনি দেখালেন। 'লায়লী মজনু'র মূল লেখক জামী ছিলেন সুফী সাধক। আবার অনুবাদক কবি বাহরাম

খানের উপরেও সূফীপ্রভাব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ছায়া ফেলেছিল যেহেতু তখনকার সমাজে সূফী ধ্যান-ধারণা ব্যাপকভাবে কার্য্যকরী ছিল। সুতরাং লায়লী মজনু যে সূফীভাব সম্বলিত কাব্য তাতে কোন সন্দেহ নাই।

লায়লীর জন্য মজনুর যে অশেষ দুঃখকষ্টকে স্বীকার করে নেওয়া, যে নিরবচ্ছিন্ন সাধনা—তা হচ্ছে ঈশ্বরকে বা পরমাত্মাকে পাওয়ার জন্য ভক্ত বা জীবাত্মার ঐকান্তিক সাধনা। এই কঠিন সাধনপথের মন্ত্র হচ্ছে প্রেম—শক্তিও জোগায় প্রেম। লায়লীর প্রেমে মজনু ভিখারী সেজেছে, লোকালয় ত্যাগ করে নজদের বনভূমিতে গিয়ে ধ্যান-মগ্ন হয়েছে; মনের অশেষ দুঃখকে ভুলবার জন্য গায়ের কাপড় টুকরো টুকরো করে ফেলেছে—শেষে কেঁদে বুক ভাসিয়েছে। এবং এক পর্যায়ে দেখা গেছে প্রেমে সে এতই উন্মাদ যে লায়লীর কুকুরকে পর্যন্ত প্রিয় মনে করে তার পায়ের ধুলো চোখে মাখতে শুরু করেছে। এ এক অদ্ভুত অবস্থা! এ মজনু সম্পূর্ণভাবে প্রেম দেওয়ানা। এ যেন সেই বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা। কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য রাধা যেমন সংসারের সকল বাধাকে অতিক্রম করে ছুটে যাচ্ছে, পথের অশেষ লাঞ্ছনাও যাতে সহ্য করতে পারে সেজন্য কলসী কলসী পানি ঢেলে পিছল করে—পিছল পথে হাঁটার মহড়া দিচ্ছে—এখানে মজনুও তেমনি লায়লীর জন্য অশেষ কষ্ট স্বীকার করছে। শেষ মুহূর্তে তাকে না পাওয়ার দুঃখ এতই আঘাত দিল যে সেই আঘাতে তার মানসলোকের দ্রুত পরিবর্তন ঘটলো। তার দৈহিক প্রেম আধ্যাত্মিক প্রেমে রূপান্তরিত হলো। দেহের কামনা বাসনা তিরোহিত হয়ে হৃদয় এক অলৌকিক ঐশ্বর্য ও ঔদার্যে ভরে উঠলো। প্রেমে ও ত্যাগের অগ্নিদহনে দগ্ধীভূত পূত-পবিত্র হৃদয়ে সে লায়লীকে অহরহ উপলব্ধি করতে লাগলো। এই যে উপলব্ধি এ হচ্ছে ভক্তের হৃদয়ে ঐশ্বরিক উপলব্ধি। প্রেমিক মজনু লায়লীকে পায় নাই। কিন্তু ভক্ত—প্রেম দিওয়ানা মজনু তার প্রেমাস্পদকে পেয়েছে হৃদয়ের মণি কোঠায়। বৈষ্ণব সহজিয়া সাধকেরা বলেন—দেহই সকল শক্তির আধার। সকল তত্ত্ব দেহের মধ্যেই। সূফী মতেও তাই। তারা মনে করেন—সাধনার দ্বারা দেহ ও মনকে বিশুদ্ধ করলে পরম স্বরূপকে অন্তরে পাওয়া যায়। তাই সূফী কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

তোরি ভিতর অতল সাগর
তার পাইলি না মরম

তার নাই কুল কিনারা শাস্ত্রধারা
নাই ধরম কি মরম।

মজনু যতদিন 'অতল সাগরের' মর্ম বুঝতে পারে নাই ততদিন যে উন্মাদ। কিন্তু শেষে যখন অতল সাগরের রহস্য উপলব্ধি করলো, তখন বুঝলো সকল দুঃখ তার ফুল হয়ে ফুঠেছে। অতল সাগর তার অন্তরে বিরাজমান। সে দাঁড়িয়ে আছে সেই পূণ্যতীর্থের সাগর কিনারে। সাধনায় সে উত্তীর্ণ। তাই তার সকল অস্থিরতা পরম স্থৈর্যে রূপান্তরিত হলো। মজনুর এই ত্যাগ ও তিতিক্ষা, এই মরমী উপলব্ধি যুগে যুগে ভক্ত ও সাধকদের তপস্যার পথে প্রেরণা যোগাবে।

॥ ৬ ॥

বাউল, মারফতী, মুর্শিদী ঃ মরমী সাহিত্যের মণিমুক্তা

আমাদের মরমী সাহিত্যের সবই প্রায় কবিতা। আর এই মরমী কবিতার ভাণ্ডারকে বিশেষভাবে পরিপুষ্ট করেছে যে বিষয়টি তা হচ্ছে বাউল গান—মারফতী ও মুর্শিদী গান। গান বাঙালীর প্রাণের জিনিস। উৎসবে গান, আনন্দে গান, শোকের বিলাপেও গান। আবার তারা যখন ভাবনার অতল সাগরে ডুব দিয়ে মানিক রতন আহরণের চেষ্টা করে—চেষ্টা করে জগতের সকল রহস্যের মূলে কে আছে তাকে জানতে কিম্বা কোথা থেকে এলাম আমরা যাবই বা কোথায়? এই যে সংসারে পুতুল নাচের মেলা বসেছে—কে এই পুতুলনাচের যাদুকর তাকে খুঁজে বের করার আকুল প্রয়াসে ব্যাকুল হয়ে পথে বেরিয়ে পড়া—ইত্যাকার সকল ক্ষেত্রেই বাঙালীর মনের ভাবটি বেরিয়ে এসেছে গানের সহজ সুরে। এই গানগুলি বড় প্রাণস্পর্শী বড় কোমল। অনেক সময় এর সুরের যাদুতে সংসারী মানুষও উদাস হয়ে পড়ে। তত্ত্ব জিজ্ঞাসু প্রাণের একতারাতে ঝংকৃত গান যখন হাতের খঞ্জনীর সুরে সুর মিলায়, তখন গৃহী মানুষের প্রাণও সেই খঞ্জনীধারীর পিছু পিছু ছুটে যায় কোন অজানার উদ্দেশ্যে অচেনাকে চিনতে। এভাবেই কত শত মানুষ যুগে যুগে অধ্যাত্মবাদী-তত্ত্বাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে। বাউল গানও এই ধরনের অধ্যাত্মবাদী-তত্ত্বাশ্রয়ী মানুষের রচনা। তবে এ গানের রচয়িতারা বিশেষ শিক্ষিত নয়। নিম্নস্তরের সাধারণ মানুষ এরা। মুর্শিদী-মারফতী গানও বাউল গানেরই একেকটি শাখা। এসব গান আমাদের পল্লী মরমী সাহিত্যের অমূল্য রত্ন বিশেষ।

এদেশের শিক্ষিত সমাজ আগে বাউল গান সম্বন্ধে খুব বেশী একটা জানতেন না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বাউল ও বাউলগান সম্পর্কে

শিক্ষিত সমাজে নতুনভাবে আলোকদান করেন। এই গানের সুর মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে এর ভাব-সম্পদ মূল্যায়ন করতে যেয়ে তিনি যথার্থই বলেছেন—"ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে এর তুলনা মেলে না।" এতে "যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব, তেমনি ভক্তির রস মিশেছে।" রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় আছে—

যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই
পাইলে পাইতে পার অমূল্য রতন।

আমাদের খোঁজার ধৈর্য নেই বলেই বহু অমূল্য রত্ন থেকে আমরা বঞ্চিত থাকি। এবং নিজেদেরকে রিক্ত ভাবি। অথচ আমাদেরই চার পাশে পল্লীভিত্তিক বাংলাদেশের আনাচে কানাচে রয়েছে বাউল-মুর্শিদী-মারফতী-ফকিরী গানের মত উচ্চতর ভাবসম্পন্ন গানের সম্ভার। সম্প্রতি বিভিন্ন গুণীজনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাউল গান্রের সংগ্রহ চলেছে। অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন, ডঃ মযহারুল ইসলাম, ডঃ আহমদ শরীফ প্রমুখ পণ্ডিতদের রচিত গ্রন্থ থেকে আমরা বাউলদের মত, পথ, সাধনা ও রচনা সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারি।

বাউলরা দরিদ্র—বিষয়বিমুখ। গান করে ভিক্ষা করাই তাদের জীবিকা অর্জনের পথ। কিন্তু অন্তরের দিক দিয়ে তারা যে কত ঐশ্বর্যবান তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। বাউলদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী বলেছেন—"বাউল গান যেন আমাদের দেশের ভুঁইচাপা ফুল—মাটির খুব কাছাকাছি; সহসা নজরে পড়ে না। অলক্ষ্যে ফোটে, সুদুর আকাশের আলোর পানে পাপড়ি মেলিয়া ধরে। আপন মনে বাতাসে দোল খায় খুশীর মৌজে নিজের মধ্যেই নিজে ডুবিয়া থাকে। নিটোল তাহার স্বাস্থ্য আর অঢেল সৌন্দর্য।" প্রমাণ স্বরূপ ধরা যাক কবি লালন ফকিরের এই গানটি ঃ

মনের মাঝে অচিন পাখি
কেমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মনবেড়ী
দিতাম তাহার পায়।

এই গানটির মধ্যে ভাবের যে উচ্চতা রয়েছে, যে নিগূঢ় তত্ত্ব রয়েছে এবং যে উপমা ব্যবহৃত হয়েছে তা মরমী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলেই পরিগণিত।

'বাউল' শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানামুনির নানামত। এই বিশেষ ধরনের গান রচয়িতাদের 'বাউল' বলা হয় কেন এটা একটা প্রশ্ন বটে। কেউ বলেন 'বাতুল' (পাগল) শব্দ থেকে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি। আবার কেউ বলেন 'ব্যাকুল' শব্দ থেকেই 'বাউল' এসেছে। অবশ্য দুটি উৎসকেই যথার্থ ধরা যায়। সংসারে থেকেও যারা সংসার নিয়ে মাথা ঘামায় না, ভিক্ষার অন্ন খেয়ে বাঁচে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ায় বিচিত্র পোশাকে এবং যাদের সাধন পদ্ধতিও বিচিত্র তারা বাতুল বা পাগল ছাড়া আর কি হতে পারে? আবার তাদের ব্যাকুলতাও বড় মর্মস্পর্শী। মনের মানুষের অন্বেষণে তারা ব্যাকুল হয়ে ঘুরে বেড়ায় একতারা হাতে নিয়ে। তাদের কথায় বার্তায় আচার আচরণে পোশাকে পরিচ্ছদে সেই ব্যাকুলতার ছাপ সুস্পষ্ট। সুতরাং 'বাতুল' ও 'ব্যাকুল' দুটি শব্দই বাউলের আদি উৎস হতে পারে। বাউল মত নানা মতের মিশ্রণে গঠিত। বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতের সঙ্গে বৈষ্ণব সহজিয়া ও সুফী মতের প্রভাবেই এই মতবাদের উৎপত্তি হয়েছে। ডঃ আহমদ শরীফ বলেন—"যেসব প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ইসলাম গ্রহণ করেছিল আর যেসব প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ হিন্দু সমাজভুক্ত হয়ে নিজেদের পূর্ব-পুরুষের ধর্মাচরণে রত ছিল, তারাই কালে বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছে। বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সাধারণ উত্তরাধিকার ছিল বলেই হিন্দু মুসলমানের মিলনে বাউল মত গড়ে উঠতে পেরেছে। হিন্দু প্রভাবে বাউল গানে রাধা-কৃষ্ণ শিব-শিবানী, মায়াব্রহ্ম প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়েছে। আর মুসলিম প্রভাবে আল্লাহ, কাদের, রসুল, মোহাম্মদ, আলি, ফাতেমা, মঞ্জিল প্রভৃতি রূপক প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে। আবার বৌদ্ধ নাথ-নিরঞ্জনও পরিত্যক্ত হয়নি।" বাউল সম্প্রদায়ে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের লোকই আছে। কিন্তু তাদের মধ্যে কোন শ্রেণী বৈষম্য বা জাতিভেদ নাই। তারা কেবল ব্যাকুল হয়ে ফিরছে একই উদ্দেশ্যে—একই লক্ষ্যের পানে।

লক্ষ্যের দিক থেকে চর্যাপদের সিদ্ধাচার্য, বৈষ্ণব সহজিয়া সাধক ও সুফীদের সঙ্গে বাউলদের ঐক্য রয়েছে। সিদ্ধাচার্যদের 'মহাসুখ বা পরমানন্দ', বৈষ্ণবদের 'পরমাত্মা' সুফীদের 'মাশুক বা প্রেমাস্পদ' আর বাউলদের 'মনের মানুষ', 'অচিন পাখি' সবই সেই একই ঈশ্বরের প্রতীক। ঈশ্বরকে পাওয়াই যে জীবনের পরম সাধনা এবং তাকে পেতে হলে বাইরে না খুঁজে নিজের অন্তরেই যে খুঁজতে হবে এ বিষয়ে সবাই একমত। মোট কথা

দেখা যাচ্ছে, চর্যাগীতির মধ্যে যে তত্ত্বসাহিত্য বা মরমী সাহিত্যের উন্মেষ হয়েছে তাই সরস পরিণতি লাভ করেছে বাউলগীতির মধ্যে। তাই চর্যার সিদ্ধাচার্য যখন বলেন—

"ঘরে অচ্ছই বাহিরে কুই পুচ্ছই" কিম্বা
"দেহহি বুদ্ধ বসন্তি ন জানই।"

তখন বাউল কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

আছে মক্কা মদীনা এই দেহে
দেখনারে মন চেয়ে
দেশ দেশান্তরে দৌড়িয়ে এবার
মরিস কেন হাঁপিয়ে।

সুফীমতে বলা হয় জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে প্রেমসম্পর্ক বর্তমান। বাউলরাও তাই বলে। তবে তারা পরমাত্মার নাম দিয়েছে সাঁই, অচিন পাখি, মনের মানুষ ইত্যাদি। তারা মনে করে জীবদেহের মধ্যেই পরমাত্মার বসত। সুতরাং তাকে জানতে হলে জীবদেহের বিশ্লেষণই আগে করতে হবে। এজন্যই বাউলদের অধ্যাত্ম সাধনা—দেহবাদী সাধনা। বিভিন্ন গানের মধ্যে তাদের এই অধ্যাত্ম সাধনার স্বরূপ নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

১

বাংলাদেশ আউল-বাউল আর পীর-ফকিরের দেশ। বিভিন্ন জেলায় অসংখ্য পীর-দরবেশ, বাউল, মুর্শিদ ছিল বা এখনো আছে। তাদের রচিত গানগুলি মুখে মুখে গীত হয়ে সারা দেশ প্লাবিত করে রেখেছিল। এগুলি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। যেসব বাউল কবির রচনায় আমাদের মরমী সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে তাদের মধ্যে লালন ফকির, সিরাজ সাঁই, পাঞ্জু শাহ, পাগলা কানাই, দুদ্দু শাহ, যাদুবিন্দু, আরকুম, ইয়াসিন, প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

লালন শাহঃ বাউল কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ লালন শাহ। ইনি লালন ফকির নামেও পরিচিত। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম লালন ফকিরের গান প্রকাশ করেন এবং তাঁকে বাংলা সাহিত্য রসপিপাসুদের মধ্যে পরিচিত করেন। অধ্যাপক মনসুরউদ্দিন লালন গীতিকাগুলি তাঁর হারামণি গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

লালন শাহের জন্ম হয় ১৭৭৪ সালে এবং মৃত্যু হয় ১৮৯০ সালে। এঁর জন্মস্থান ও জাতি নিয়ে নানাজনে নানামত প্রকাশ করেছেন। অবশ্য যারা নমস্য, তাদের নিয়ে যুগে যুগে বহু বিতর্কের অবতারণা হয়েছে। সবাই চায় তাকে আপন করে আপন অধিকারে রাখতে। কিন্তু যিনি মহৎ—আত্মা যার বিরাট, তিনি কোন একজনের হতে পারেন না, কোন স্থানে ধরেন না, কোন কালেও ধরেন না। তিনি সর্বজনের, সর্বকালের—সর্বস্থানের। এক কথায়—তিনি সার্বজনীন। কবি লালন শাহও সার্বজনীন। কেউ বলেন—তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক, আবার কেউ বলেন মুসলিম। কেউ বলেন—কুষ্টিয়া জেলায় তাঁর জন্ম, আবার কেউ বা বলেন যশোহর জেলায়। অবশ্য প্রকৃত গবেষকদের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি ছিলেন জাতিতে মুসলিম এবং যশোহর জেলার হরিণাকুণ্ড, থানার হরিশপুর গ্রামেই তাঁর জন্মস্থান। তবে কুষ্টিয়া জেলার ছেঁউড়িয়াতে তাঁর মাজার রয়েছে। এখানে তিনি বহুদিন বাস করেছিলেন। শোনা যায় ছেঁউড়িয়া গ্রামের কালীগঙ্গা নদীর পার্শ্বে একবার বসন্ত রোগাক্রান্ত হয়ে যখন তিনি অচৈতন্য অবস্থায় পড়েছিলেন তখন তাকে মলম কারিগর নামে একজন মুসলমান তন্তুবায় গৃহে নিয়ে যান এবং সেবা শুশ্রূসার দ্বারা রোগমুক্ত করে তোলেন। এর কাছেই লালন শাহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মলম কারিগর ছিলেন সিরাজ সাঁই এর শিষ্য। সিরাজ সাঁই লালনকেও শিষ্য করে নেন। সম্প্রতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লালন শাহের জন্মস্থান ও জাতি নির্ণয় নিয়ে বেশ কিছু লেখা বেরিয়েছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যারা মহৎ, পৃথিবীর কল্যাণব্রতে উৎসর্গীকৃত প্রাণ—তাদের জাতিকুল নিয়ে বাছবিচারের কিছু নেই। অধ্যাপক মনসুরউদ্দিন বলেন—"তাঁহার গানই তাঁহার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। তাঁহার গানেই তাঁহার সাধনার ও প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়।" অবশ্যই সত্য কথা। বাংলাদেশে লালনের যত শিষ্য আছে, তারা হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়েরই।

লালন ছিলেন বাউল মতের অনুসারী। তাঁর গানগুলির মধ্যে তাঁর কবি-মানসের স্বরূপ তথা তাঁর মরমী স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। বাউলেরা গুরুবাদী—যোগসাধনা ও দেহতত্ত্বে বিশ্বাসী। লালনের রচনায় এসব তত্ত্বকথা অতি সুন্দর ও সরস ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর রচিত নিম্নোক্ত গানটির মধ্যে যে তত্ত্বকথা ও ভাবের দ্যোতনা প্রকাশ পেয়েছে তাতে এটি মরমী

সাহিত্যের অমূল্য সম্পদে পরিগণিত হয়েছে—

বাড়ীর কাছে আরশী নগর সেথা এক পড়শী বসত করে
আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।
গেরাম বেড়ে অগাধ পানি
নাই কিনারা নাই তরণী পারে,
মনে বাঞ্ছা করি দেখব তারে
কেমনে সে গাঁয় যাইরে।
কি কব সেই পড়শীর কথা
ও তার হস্তপদ স্কন্ধ মাথা নাইরে,
ও সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের পরে
ক্ষণেক ভাসে নীরে।
পড়শী যদি আমায় ছুঁতো
যম যাতনা সকল যেত দূরে
সে আর লালন একখানে রয়
লক্ষ যোজন ফাঁক রে।।

বাড়ীর কাছেই পড়শীর বসতি অথচ একদিনও তাকে দেখতে না পেয়ে লালনের এই যে ক্রন্দন—এই ক্রন্দনই সমগ্র বাউল সম্প্রদায়ের। এবং একই জায়গায় থেকেও দুজনের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান, সেই ব্যবধান অতিক্রমের চেষ্টাই হচ্ছে বাউলের সাধনা। সূফী মতে "জীবাত্মার মধ্যেই পরমাত্মার স্থিতি। কাজেই আপন আত্মার পরিশুদ্ধিই খোদা প্রাপ্তির উপায়।" তাই আত্মার স্বরূপ উপলব্ধির সাধনাই এদের প্রাথমিক ব্রত। বাউলদেরও সেই কথা। আত্মাকে জানলেই পরমাত্মাকে জানা হয়। তাই দেহাধারস্থিত আত্মাকে জানাই বাউলদের ব্রত। আত্মায় অবস্থিত পড়শীই লালনের মনের মানুষ যার খোঁজে যুগে যুগে বাউলেরা ঘরছাড়া। মনের মানুষকে না পেয়ে বাউলেরা যে কি মর্মান্তিক যাতনায় পাগল হয়ে বেড়ায় তা হৃদয়গ্রাহী ভাষায় প্রকাশ করেছেন শিলাইদহের আরেকজন বাউল কবি গগন হরকরা। গগন হরকরা শিলাইদহে চিঠি বিলি করতেন। হয়তো তিনি অনেক গানই রচনা করেছিলেন। কিন্তু তার একটি মাত্র গান পাওয়া গেছে। কবি রবীন্দ্রনাথ এটি গগন হরকরার মুখেই শুনেছিলেন। এর মধ্যে ভাবের যে উচ্চতা এবং তত্ত্ব ব্যক্ত হয়েছে তার কোন তুলনা নেই।

এক গগনের কণ্ঠে যেন সমগ্র বাউল সমাজ হাহাকার করে উঠেছে।

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যেরে
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশ্যে
দেশবিদেশে বেড়াই ঘুরে।
লাগি সেই হৃদয় শশী
সদা রয় প্রাণ উদাসী
পেলে মন হোত খুশী
দেখে তায় নয়ন ভরে।
আমি প্রেমানলে মরছি জ্বলে
নিভাই কেমন করে?
মরি হায় হায় রে।
ও, তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে
ওরে দেখ না তোরা হৃদয় চিরে
দিব তার তুলনা কি,
যার প্রেমে জগৎ সুখী
হেরিয়ে জুড়াব আঁখি
সামান্যে কি দেখতে পারে তারে?
তারে যে দেখেছে সেই মজেছে
ছাই দিয়ে সংসারে।
মরি হায় হায় রে।
ও, সে না জানি কী কুহক জানে
অলক্ষ্যে মন চুরি করে
কুলমান সব গেল রে।
তবু না পেলেম তারে,
প্রেমের খেলা নাই অন্তরে।ঃ
তাই তো মোরে দেয় না দেখে সে রে।
ও, তার বসত কোথায় না জেনে তায়
গগন ভেবে মরে।
মরি হায় হায় রে।

ও, সে মানুষের উদ্দেশ জানিস যদি
(কৃপা করে আমার সুহৃদ হয়ে)
ব্যথায় ব্যথিত হয়ে আমায় বলে দেরে ।।

কিন্তু যে মানুষকে না পেয়ে গগন ভেবে মরছে, বিরহে দগ্ধ হচ্ছে—সে মানুষ যে রয়েছে অতি কাছে, নিজ অন্তরেই। তাঁকে দূরে খুঁজলে তো পাওয়া যাবে না। তাই লালন বলেন—

না জেনে ঘরের খবর তাকাও কেন আসমানে ?
চাঁদ রয়েছে চাঁদের কাছে ঘরের ঈশান কোণে।
প্রথম চাঁদ উদয় দক্ষিণে
কৃষ্ণ পক্ষে আঁধার হয় বামে
আবার দেখ শুক্লপক্ষে কিরূপে হয় দক্ষিণে।
খুঁজিলে আপন ঘরখানা
পাইবে সকল ঠিকানা
বার মাসে চব্বিশ পক্ষ অধর ধরা তার মনে।
স্বর্গ চন্দ্র মানিক চন্দ্র হয়
তাহাতে বিভিন্ন কিছু নয়
একচাঁদ ধরিলে সে চাঁদ মিলে
লালন কয় নিজনে ।।

মনের মধ্যে মন মানুষকে পেতে হলে—চাঁদের মধ্যে চাঁদের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে সাধনা করতে হবে এবং সে সাধনায় পথ প্রদর্শক হবে গুরু বা মুর্শিদ। লালন বলেন—

গুরুপদে নিষ্ঠা মন যার হবে
যাবেরে তার সর্বস্ব ধন
অটল অমূল্য নিধি হাতে সেই পাবে।
গুরু যার হয় কাণ্ডারী
চালায় সে অচল তরী
তুফান বলে ভয় কি তারি
নেচে গেয়ে ভব পারে যাবে।
আগমে নিগমে তায় কয়
গুরু রূপে দীন দয়াময়

অসময়েই সুখী সে হয়
কাঙাল হয়ে যে তারে ভজিবে।
গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান যার
অধঃপাতে গতি হয় তার
লালন বলে তাই আজ আমার
ঘটলো বুঝি মনের কুস্বভাবে।

মনের মানুষকে পাওয়ার পথে গুরুই হচ্ছে আসল কাণ্ডারী। তার প্রতি নিষ্ঠা থাকলে—দুঃখকে বরণ করলে সত্যিকারের সুখী হওয়া যায়; পার্থিব সম্পদ হয়তো হারাতে হয় কিন্তু ধরা দেয় সেই অধর মানুষ—অচিন পাখী। বাউলমতে মানুষের আত্মতত্ত্ব জানাটাই হচ্ছে সিদ্ধিলাভের উপায়। বেদ বেদান্ত পড়লে এই তত্ত্ব রহস্য উদঘাটন করা যাবে এই ধারণা ভুল। তাই লালন শাহ বলেন—

বেদে কি তার মর্ম জানে
যে রূপে সাঁইর লীলা খেলা
আছে এই দেহ ভুবনে।
পঞ্চ তত্ত্ব বেদের বিচার
পণ্ডিতেরা করে প্রচার
মানুষ তত্ত্ব ভজনের সার
বেদ ছাড়া বৈরাগ্যের মনে।
গোলে হরি বল্লে কি হয়
নীরে ক্ষীরে যুগলে কি রয়
নিগূঢ় তত্ত্ব নিরাশা পায়
সাঁইর বারামখানা সেইখানে।
পড়িলে পায় পদার্থ
আত্মতত্ত্বে যার ভ্রান্ত
লালন বলে সাধু মহান্ত
সিদ্ধি আল্লারে চিনে।

পণ্ডিতেরা বেদবেদান্ত বিচার করে পঞ্চতত্ত্ব প্রচার করতে পারেন। কিন্তু সকল ভজন-সাধনের সার কথা যে মানবতত্ত্ব জানা একথা বেদে পাওয়া যায় না। কিম্বা পরমাত্মা বা সাঁই যে কিভাবে মানুষের মধ্যে বিরাজ করেন

সে বিষয়েও বেদ নিশ্চুপ। সুতরাং এমন বেদের প্রতি বাউলদের ভক্তি নাই।

বাউলদের সাধন পদ্ধতি বিষয়ক বহু গান লালন শাহ লিখেছেন। তাঁর গানে আল্লাহ্, রসুল, নবী, রাধাকৃষ্ণ, হরি ইত্যাদি সবকিছুই আছে। বোঝা যায় তিনি ছিলেন উদার মতাবলম্বী। তাই নির্বিশেষে সব ধর্মের কথাই তার গানে অছে। বস্তুতঃ সব বাউলেরাই উদার প্রেমপন্থী। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান এমন কোন বাছ-বিচার তাদের মধ্যে নাই।

পাঞ্জু শাহঃ যশোর জেলার শৈলকুপা গ্রামে ১২৫৮ বঙ্গাব্দে পাঞ্জু শাহ জন্মগ্রহণ করেন। সে সময়ে দেশে তত্ত্বসঙ্গীত বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। পাঞ্জু শাহ নিজে গান-বাজনা পছন্দ করতেন, কিন্তু তাঁর পিতা এসব অনৈসলামিক ব্যাপার পছন্দ করতেন না। তাই পিতার মৃত্যুর পরে পাঞ্জু শাহ গান-বাজনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। এ সময়ে সাধু সুফী দরবেশদের সঙ্গেও তিনি মেলামেশা শুরু করেন। বস্তুতঃপক্ষে বাউলতত্ত্বের প্রতি আকর্ষণ তাঁর তখন থেকেই শুরু হোল। এই সময় তিনি অনেক গান রচনা করেন যেগুলোর ভাব অতি উচ্চস্তরের। এই গানগুলি পুঁথির আকারে এক সময়ে বাজারে পাওয়া যেত। "সম্প্রতি তাঁর পুত্র রফিউদ্দিন তাঁর কিছুসংখ্যক গান অন্যান্য বাউল ফকীরের গানের সঙ্গে 'ভাবগঙ্গী' নাম দিয়ে মুদ্রিত করেন।" তিনি আরও একখানা পুঁথি রচনা করেছিলেন। সে খানার নাম 'ইশকে সাদেকী গহর।' এই গ্রন্থখানা ইসলামী তত্ত্ব কথায় পরিপূর্ণ। তাঁর অধিকাংশ গানই আল্লাহ্, রসুলের প্রশংসায় পূর্ণ। নিম্নলিখিত গানটিতে তিনি সৃষ্টি রহস্য বর্ণনা করেছেন এবং সৃষ্টির মূলে যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ রয়েছেন তাঁকে পাওয়ার জন্য সর্বদা নাম জপ করতে বলেছেন। পাঞ্জু শাহ বলেছেন—

ভজো নিরঞ্জনে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ো আমার মন
বড় অমূল্য রতন, এ নাম নিদানের ধন।
যখন আসমান জমিন নাহি ছিল রে
ছিলেন একা মাওলা ধন,
বড় সাধ করিয়ে গঠলেন
আল্লাহ্ খাকি আদম তোন।
কে বুঝিতে পারে আল্লারে তোমার মক্কর

শুনি বড় দোস্ত ছিল তোমার আজাজিল খাস তোন ।
তাবেদার ছিল তার রে ফেরেস্তা যতজন
সেই আজাজিল দোষী হল আদমের কারণ ।
খাক হইতে খাকি আঁকি আল্লারে, গঠলে আদম তোন
কোন চিজে হাওয়া বিবি করিলে সৃজন ।
মক্কর মক্রোল্লা আল্লারে, তারে খাওয়ালে গন্ধম ।
সেই গন্ধম খেয়ে আশক জ্বালায় জ্বলে দুইজন ।
আরফার মাঠে আল্লারে দোহায় করিলে মিলন ।
নূর নীরে করলে আল্লাহ্, সৃষ্টির পত্তন ।
কে বুঝিতে পারে আল্লার কুদরতের বিবরণ ।
অধীন পাঞ্জু বলে, নূর সাধিলে পাইতাম চরণ ।

কবি এখানে আল্লার অপার লীলারহস্যের কথা বলেছেন্। তিনি বলছেন, আল্লাহ্ মানুষকে অতি সাধ করে সৃষ্টি করেছেন। নইলে যে আজাজিল ছিল ফেরেস্তাদের প্রধান—যাকে আল্লাহ্ বন্ধু মনে করতেন তাকেও এই আদমের কারণেই অভিশপ্ত করবেন কেন? যে আল্লার রহস্যের কোন সীমা পরিসীমা নাই তাঁকে পাওয়ার জন্য সর্বদা 'লা-ইলাহা' নাম জপতে হবে।

চর্যাকারদের মত বাউলেরাও তত্ত্বের আবরণে বহু তথ্য পরিবেশন করেছেন। তাদের ব্যবহৃত বহু শব্দের অর্থ হয়তো আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। তবে এটা ঠিকই বোঝা যায়, নিজেদের সাধন পদ্ধতি সম্বন্ধে বাউলরা বেশ ভাল জ্ঞানই রাখে। আর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে চাইলে এ জ্ঞান রাখতেই হবে। নইলে কেবল নামেই বাউল হবে—সতিকার অর্থে নয়। কবি পাঞ্জুশাহের একটি গানে এটি সুন্দররূপে ব্যক্ত হয়েছে—

আমার মন আপন দেহ চেন।
দেহের খবর না জানিয়ে মিছে কোট কাছারী করছো কেন।
কুল দুনিয়ার খবর আছে, আঠার মোকামের মাঝে
কোন মোকামে সাঁই বিরাজে হুশিয়ার হয়ে তাহা জান।
লাহুত, নাছুত, মলকুত, জবরুত, কালের রুহু দেল দম ধর।
চার মোকামে চারি ধর, লা মোকামে সাঁইর আসন।
লাহুত মোকামের ধারা, জানলে যাবে অধর ধরা

তবে পাবি কুল কিনারা, জেনে ভজ গুরু ধন ।।
আত্মতত্ত্ব, পরমতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব জান সত্য

অধীন পাঞ্জু পায় না অর্থ, ফকির হলাম লোক জানান ।।

বাউল সাধনায় আত্মতত্ত্ব, পরমতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেহতত্ত্ব বা শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে বাউলদের রয়েছে গভীর জ্ঞান। কারণ তারা মনে করে, দেহের মধ্যেই রয়েছে সেই মনের মানুষ, অচিন পাখী বা পরমাত্মা। তাকে জানতে হলে আগে দেহকে জানতে হবে। দেহের ব্যাপক চর্চার দ্বারা দেহকে আয়ত্তে আনতে হবে। তাই পাঞ্জুশাহ বলেন—

মন তোর ঘরে বসে মহাজন
খুঁজে মরিস কেনে তীর্থ বৃন্দাবন।
স্বরূপ নিষ্ঠা যার হয়েছে সে পায় দরশন।
আঠারো মোকাম, আট কুঠুরী মন, মধ্যে ত্রিভুবন;
পাহাড়াদি সপ্তনদী দেহে বিরাজন,
সিং দরজায় দ্বিদল পদ্মে কালার সিংহাসন।
স্থির বিজয়ীরূপে জ্যোতি মন, সঙ্গে পঞ্চজন
সিয়া, সফেদ, লাল জরদে ঘিরে সে আসন
ভক্তের হৃদয় আলো করে সে রূপের কিরণ।
তিল প্রমাণ জায়গায় বসে মন, কোটি তীর্থের ধন
সাধু সঙ্গে মহারঙ্গে পাবে অন্বেষণ,
পাঞ্জু বলে চিনলে না জীবনের জীবন।

দেহচর্যার দিক দিয়ে এদের সঙ্গে প্রাচীন নাথ সিদ্ধাদের মিল দেখা যায়। নাথ সিদ্ধাইরা 'কায়াসাধন' মন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। তাদের বিশ্বাস ছিল—কায়া সাধনায় দেহের উপর আধিপত্য জন্মে এবং অলৌকিক শক্তি লাভ করা যায়। বাউলরাও মনে করে শরীর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে জীবনের রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব। লালনের গুরু সিরাজ সাঁইএর একটি রচনায় এদের সাধন-পদ্ধতির নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন—

সময় বুঝে কেন বান বানলে না
হারে জল শুকালে মীন পলাবে ফলাবি কি মনা।

ত্রিবেণীর তিনধারে, মীনরূপে সাঁই বিহার করে
তুমি উপর উপর বেড়াও ঘুরে
মীনরূপের খেলা দেখলে না!
মাস অন্তে সেই মহাযোগ হয়
নীর হতে রস ভেসে যায়
জানিয়া সেই যোগের নির্ণয় গভীরে ডুবলে না।
মীনরূপে সে বিহার করে
কীর্তি করে শূন্য ভরে
সিরাজ সাঁই কয় লালন ওরে, কেন তারে জান না।

গুরু বা মুর্শিদ হচ্ছে বাউলদের পথ প্রদর্শক। কিন্তু যে-সে লোক এই গুরুপদের যোগ্য নয়, তাকে উপযুক্ত গুণাবলীসম্পন্ন হতে হবে। এবং দেখামাত্রই তাকে চেনা যাবে। মধুর বাউল রচিত একটি গানে গুরুর স্বরূপ চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে। গানটি নিম্নরূপ—

মহাভাবের মানুষ হয় যে-জনা
তারে দেখলে যায় রে চেনা।
ও তার নয়ন দুটি ছলোছলো
মধুমাখা তার বদনখানা।
সদায় রে তার শান্ত রতি
হৃদ-কমলে গতাগতি
করে জগতপতি সাধনা।
ও তার কাম নদীতে চর পড়েছে
প্রেম নদীতে জল ধরে না।
সদায় থাকে দমের ঘরে
নয়ন থাকে রূপের দ্বারে
পলক তো পড়ে না।
হৃদ সম্বন্ধ নাইকো রে যার
নিহেতু প্রেম বেচা কেনা।
ফলের আশা করে না সে
ফুলের মধু পান করে সে
সেই তো রসিক জনা।

মধুর রে তোর কর্মদোষে
গুরুতে বিশ্বাস হলো না।

মোট কথা গুরু হবে মহাভাবের মানুষ। ঈশ্বর-প্রেমের অভিব্যক্তিতে দুই চোখে থাকবে ছলোছলো আবেশ। সে জিতেন্দ্রিয়—স্থূল কাম-প্রবৃত্তিকে সে দমন করতে পেরেছে। তাই অমল প্রেমধারায় হৃদয় তার সদা উচ্ছ্বসিত। মনের মানুষকে সে অন্তরে পেয়েছে, তাঁর রূপ অবলোকন করেছে। তাই সে মনের আনন্দে বিনাস্বার্থে সকলকে প্রেম পরিবেশন করতে সক্ষম। এমন গুরুর পদাশ্রয় করলেই মনের মানুষকে পাওয়া সহজ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য যার—সেই কেবল এমন গুরুকে বিশ্বাস করে ধরতে পারে না।

২

বাউলরা হিন্দুই হোন আর মুসলমানই হোন, তাদের লক্ষ্য এক। তাই তাদের মধ্যে বিরোধ নেই, সংঘাত নেই। মুসলমান বাউলের-যে গুরু, হিন্দু বাউলেরও সে গুরু হতে পারে। যে নামেই ডাকুন না কেন প্রেমাস্পদ তাদের একজনই। সেই ঈশ্বর-পরমাত্মা বা মনের মানুষের বিরহেই সকলে উন্মনা। তাই বিনা দ্বিধায় বাউল মনোমোহন বলতে পারেন—

গায়েবী আওয়াজ কয় শুন রে মুসলমান।
আখেরে দুনিয়া ফানা, রাখ রে ঈমান॥
চুরি করা মিছা কওয়া
বেশরা বেপরদা হওয়া
পরহেজ সবুরে মেওয়া
কোরানে ফরমান।
জরু লাড়কা দুনিয়ার
সমঝে দেখ ফক্কিকার
মওত আসবে তার হইবে ইনসান।
দিলের গরবী ছাড়
হাদিসের কথা ধর

কেয়ামত ইয়াদ কর
হাশরের ময়দান।
হরদমে আল্লার নাম
ফুকার দুনিয়ার কাম
ভুকে অন্ন পিয়াসের পানি
এতিমেরে দিও দান।।

কিম্বা

যাবি যদি মন ফকির হাটা
মুরশিদাবাদ যেয়ে আগে পরআনা দেও মোহর আটা।
মুরশিদের পদেতে মন, খেদমতে রহ নরম
যতক্ষণ বহে দম ভুলো না মন ঐ কথাটা।।
লয়ে কলঙ্কের ডালি সইতে পার গালাগালি
পুড়তে পুড়তে হবে ছালি, ধুলাবালি আর ইটা।।
ইমান করে বসে থাক, সবুরে পরহেজ রাখ
হুজুরির দেলেতে ডাক—শক্ত করে বুকের পাটা।।
সার করে জংলা ঝুপ, দেল দরিয়ায় মার'লি ডুব
মনোমোহন কয় মন রে ডুব, ফেরত পাওয়া যায়
ফকিরের বাট্টা।।

হিন্দু বাউল মনোমোহন যখন অবলীলাক্রমে আখের, বেশরা, বেপরদা, পরহেজ, হাদিস, কেয়ামত, হাশরের ময়দান, আল্লাহ্, ইনসান প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন, তখন মুসলমান জব্বার কবি আক্ষেপ করেছেন—

মোরে প্রাণ থাকিতে ব্রজে নিলায় না।
ব্রজ বিনে প্রাণ বাঁচে না।
ওগো ব্রজ বিনে প্রাণ বাঁচে না।।
ওরে আরে ও নিতাই, আমার মনের বাসনা।
সেই গঙ্গা সেই যমুনা একই তুলনা রে
নিতাই একই তুলনা।।
আমার ব্রজে যাইবার ইচ্ছা ছিল
ও মোরে সঙ্গে করি কেউ নিলায় না।।
আছে ধরায় প্রেমঋণ, শুধিবারে সেই ঋণ

মনের বাসনা রে নিতাই, মনের বাসনা ।।
ব্রজেশ্বরী রাই কিশোরী, বুঝি আর দয়া
আমার হইল না ।।
ওরে আরে ও নিতাই ভাবিয়া ছৈঃ
জব্বারে বলে—রইতাম তোমার চরণ তলে
মনের বাসনারে নিতাই, মনের বাসনা।
বহু দিনের আশা মনে
মোরে পায় ঠেলিয়া আর দূর করিও না।
ব্রজ বিনে প্রাণ বাঁচে না।।

ব্রজ, ব্রজেশ্বরী, রাই কিশোরী, নিতাই ইত্যাকার শব্দ চয়ন দেখে বোঝা যায় মুসলমান হয়েও হিন্দু ভাবের গান লিখতে তাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না। আসলে এরা তো ছিলেন রসের বেপারী। তাই উদার চিত্তে রসের জোগান দিতেই ছিল তাদের পরমানন্দ।

৩

সিলেট শহরের নৈসর্গিক পরিবেশ বড় মনোরম। সবুজ শ্যামল প্রান্তর। মাঝে মাঝে নাতিউচ্চ টিলা বা পাহাড় শ্রেণী, পাহাড়ের ঢালু বেয়ে সুদূর বিস্তৃত চা বাগানের অপরূপ লীলাভঙ্গিমা দেখে মানুষের মন মুগ্ধ বিস্ময়ে আপনা আপনি নত হয়ে পড়ে। এই 'নতি' কার প্রতি? নিসর্গ শোভা যত বেশী মানুষকে মুগ্ধ করে, ততই সে ব্যাকুল হয়ে পড়ে, উদাস হয়ে পড়ে সে নিসর্গের অন্তরালবর্তী কুশলী কারিগরের শক্তি-মাহাত্ম্যে। তখন মানুষ ভাবুক হয়ে পড়ে—আধ্যাত্মিক চেতনা তার জাগ্রত হয়। এমন নিসর্গ পুরীতেই আবার রয়েছে সুফী সাধক হজরত শাহ জালালের দরগা মোবারক। মানুষের আত্মিক কল্যাণের জন্য এই মহাসাধকের অবদানের কথাও লোকের জানা আছে। এই দ্বিবিধ প্রভাবের ফলে সিলেট শহরে জন্ম নিয়েছে বহু সাধকপ্রাণ—পীর দরবেশ, বাউল মুর্শিদ। এই জেলাতেই জন্মগ্রহণ করেছেন খাঁটি ভক্তপ্রাণ কবি শীতলাং শাহ—যার অসংখ্য বাউল ও মারফতী গান বাংলার মানুষের প্রাণে উদাস বৈরাগ্যের সুর ঢেলে দিয়েছে। এই জেলাতেই জন্মেছে হাসন রাজা, আরকুম, ইয়াসিন প্রমুখ মরমী কবিগণ—যাদের জীবন ছিল ঈশ্বরভাবনায় উৎসর্গীকৃত। এই সব কবিকুলের রচনা আমাদের সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

শীতলাং শাহ ঃ কবি শীতলাং শাহ জন্মগ্রহণ করেন সিলেট জেলায়। ইনি একজন বিখ্যাত বাউল গান রচয়িতা। শীতলাং শাহ মাদ্রাসায় ইসলামী শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ভুবন পাহাড়ে সুদীর্ঘ বার বৎসর সাধনা করেন। তাঁর দীক্ষাগুরু ছিলেন সিলেটের মাওলানা আবদুল ওহাব সাহেব। শীতলাং বহু গান রচনা করেছেন। সেগুলি তাঁর শিষ্য হাজী আসগর আলী লিখে রাখতেন। অধ্যাপক মনসুর উদ্দিন সাহেব তাঁর শতাধিক গান 'হারামণি' গ্রন্থে সংকলন করেছেন। ইসলামে সঙ্গীতকে উৎসাহিত করা হয় নাই। অথচ বিস্মিত হতে হয় যখন দেখি শীতলাং শাহের মত একজন খাঁটি মুসলমান—যিনি মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করেছেন তিনিও গান-বাজনার ভক্ত। এমনকি তাঁর রচনায় বৈষ্ণব ভাবের প্রকাশ সুস্পষ্ট। বহু গানে তিনি রাই, সজনী, সখি, শ্যাম, চণ্ডী, ত্রিপুন্নি প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন।

তাঁর একটি গান নিম্নরূপ—

শুন শুন সখি! সজনী রাই!
সয় না লো মোর প্রেমানল, বন্ধুয়া রইলো কই।
সখি গো জ্বলে জ্বলে প্রেমানলে জ্বালা কত সই।
বন্ধুহারা প্রাণছাড়া বল বল কি রাই।
সখি গো! শুন শুন শোক বুক ধুকে ধুকে
জ্বলিয়া হইলাম ছাই।
প্রেম ভিখারী শুন নাগরী ভস্মধারী হই।
বন্ধু আস রাখ প্রাণী ঃ শুন সজনী সই।
বন্ধুয়া বিনে না লয় প্রাণে, হায় প্রাণবন্ধু কই।
বন্ধুর আশা না পাই দিশা পন্থহারা হই।
পাইলে বন্ধু গুণইন্দু হিয়াকুঞ্জে সই।।
দেখলে প্রিয়া ঠাণ্ডা হিয়া, দুঃখ রবে নাই
মরি আহা মরি রূপে নিছনি লই।
মান্থহারা জনমভরা কলঙ্কিনী হই।
প্রেমানলে দেহ জ্বলে রসিক পাইলে কই।
হিয়া টুটে প্রাণ ফাটে জ্বলি খাক হই।
আস গো ধনি গুণমনি পদাশ্রয়ী হই।

শীতলাং বলে অঙ্গে দোষ না গেলে সই।
পাইলে বন্ধু গুণসিন্ধু, বিনয় করি কই।

ভাব-সমৃদ্ধির দিক দিয়া বৈষ্ণব কবি-শ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের সঙ্গে শীতলাং শাহের যথেষ্ট মিল রয়েছে। শীতলাং শাহের রচিত নিয়োক্ত পদটি চণ্ডীদাসের একটি পদের সঙ্গে তুলনীয়। যেমন—

পীরিতির শেল বুকে যার কলঙ্ক তার অলঙ্কার
কুলমানের ভয় নাই রে।
পীরিতির নয় নিশানি, সদায় থাকে মন
উদাসিনী গো।
সদায় থাকে প্রেমানন্দে, নিরানন্দ নাহি তার।
ক্ষুধা তৃষ্ণা না লয় মনে, নিদ্রা নাই তার দুই নয়নে গো
স্বরূপে মন মজাইয়া করে সেইরূপ নিহার।
হাসিরাশি নাই তার মনে, সদাই থাকে
মোর নয়নে গো।
নাইরে তাহার লাজভয়, নাহি তাহার অহঙ্কার।
প্রথম পীরিতি মজা, দ্বিতীয় পীরিতে সাজা গো
তৃতীয় পীরিতির মাঝে রঙ্গ খুশী বে-শুমার।
যার গলে প্রেমের ফাঁসি, যে হইয়াছে
সকলের দাসী গো।
লোকের নিন্দন পুষ্প চন্দন গলেতে পাইয়াছে হার।
শীতলাং ফকিরে বলে প্রেমের মালা যার গলে গো
কেহর কথা নাহি শুনে কেবল তার বন্ধু সার।

অর্থাৎ মদন বাণে যার হৃদয় বিদ্ধ হয়েছে, সে আর লোক-লাজের ভয় করে না। ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে সে সর্বদা প্রেমাস্পদের ধ্যানমগ্ন থাকে। বন্ধুর প্রেমের মালা যে পেয়েছে লোকের নিন্দা-ধিক্কারকে সে পুষ্পচন্দন মনে করে বরণ করে নিতে পারে। ঠিক চণ্ডীদাসও তাই বলেছেন—

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
বধুঁ তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ।

সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভালমন্দ নাহি জানি
কহে চণ্ডীদাস পাপপূণ্য মন
তোমার চরণ মানি।

বন্ধুর জন্য কলঙ্কিনী আখ্যা পেলেও কোন দুঃখ নাই। পরমানন্দে কলঙ্কের হারকে অলঙ্কার করে নিবে। ভালবাসা পাপ কি পুণ্য তাতো কেবল বন্ধুই বিচার করতে পারে।

শীতলাং ফকিরের রচনায় বৈষ্ণব ভাবের স্ফুরণ দেখা গেলেও তিনি যে পরহেজগার মুসলমান ছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে তাঁর অন্যান্য গানগুলির মধ্যে। তিনি মুসলমানদের উপদেশ দিয়ে বহু গান রচনা করেছেন। সেগুলি খাঁটি ইসলামী নিয়ম নীতির অনুসারে। যেমন—

জিন্দেগী যার রে কুপন্থে গমন
জিন্দেগী থাকিতে কর বন্দেগী বরণ।
কালেমা নামাজ রোজা করবে সাধন
নবীর তরীকায় কর প্রভুকে ভজন।
শুদ্ধভাবে কালেমা চিতে কর রে স্মরণ
পাঁচ আনফাসেতে কর দমের সাধন।
দমে দমে আয়ু টুটে জিন্দেগী হরণ।।
সাক্ষাতে জানিয়া ভজ প্রভু নিরঞ্জন।
নবীর তরিকায় যে বা না করে এবাদত
আল্লার লানত ঘিরে খারিজা উম্মত।
বন্দেগী করিতে আইলে ভবের সফর
পূর্বের পাশরিলে কুবুদ্ধিয়ে তোর
জিন্দেগী করিতে আইলে চলিয়া তখন
ভবকূলে প্রবেশিয়া হইলে বিড়ম্বন।
জিন্দেগী থাকিতে কর বন্দেগী আল্লার
আমানত সঙ্গে তার কর রে বিচার
ভক্তি চিত্তে প্রেমভাবে করহে ধিয়ান
প্রেমের সহিতে কর দমের যোগান।
দমের যোগানে যে করিবে আমল
সুগন্ধির সঙ্গে তার খুলিবে কমল।

শীতলাং ফকিরে কহে আল্লার মঙ্গল
মুস্তফার পদাচরণে শাফায়ত কেবল।

কবি বার বার বলছেন ধর্মের অবশ্য পালনীয় কর্তব্যগুলি সময় থাকতেই করা উচিত। নূরনবীর দেখানোর পথে থেকে পবিত্র চিত্তে আল্লাকে পাওয়ার সাধনা করতে হবে। যে নবীর প্রদর্শিত আদর্শ পথ অনুসরণ না করে, আল্লার করুণা থেকে সে বঞ্চিত হয়। নামাজ, রোজা, কালেমা মুসলমানের পক্ষে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। অথচ মানুষ জাগতিক বিড়ম্বনায় সব কিছু ভুলে থাকে। তাই জীবন থাকতেই তার সচেতন হওয়া উচিত। আল্লার সঙ্গে মানুষের প্রেমের সম্পর্ক। সুতরাং প্রেমআপ্লুত চিত্তে ভক্তিভরে তাঁর স্মরণে ধ্যানমগ্ন হওয়া উচিত। বাউলেরা যোগশাস্ত্রে বিশ্বাসী। তাই বার বার দম বা শ্বাস-প্রশ্বাস রোধ করে যোগ সাধনার কথা বলেছেন শীতলাং ফকির। এই গানটিতে কবি বলছেন—

''পাঁচ আনফাছেতে কর দমের সাধন'

কারণ—''দমে দমে আয়ুক্ষয় জিন্দেগী হরণ।''

শ্বাস প্রশ্বাস ধরে রাখার ক্ষমতা যত বেশী অর্জন করা যাবে, মানুষের জীবনীশক্তিও ততই বৃদ্ধি পাবে। শুধু তাই নয়—

''প্রেমের যোগানে যে করিবে আমল
সুগন্ধির সঙ্গে তার খুলিবে কমল।''

যে প্রেমাপ্লুত চিত্তে দম ধারণের ক্ষমতা অর্জন করবে, তার সমস্ত হৃদয় সাধনার পথে ফুটন্ত কমলের মত বিকশিত হয়ে উঠবে।

বাউলদের উপমা-রূপকগুলি বড় চমৎকার। মানুষের দেহকে জাহাজের সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রাণের উপমা সারেঙ। সামনের চক্ষু জোড়া ইলেকট্রিক বাতি। এই দেহের ভিতরে কত যে জোড়া, কত যে কলের কারিগরী কৌশল রয়েছে তার অন্ত নেই। কিন্তু যে এমন বিচিত্র জাহাজ তৈরী করলো, সে কারিগর—সে ইঞ্জিনিয়ার কোথায়? তাকেই তো অন্বেষণ করে মরছে বাউলেরা।

কে বানাইল কলের জাহাজ মিস্ত্রি কোথায়?
বানাইয়া রঙ্গের জাহাজ মিস্ত্রি লুকায়।
কে বানাইল কলের জাহাজ মিস্ত্রি কোথায়?
ধন্য রে তার কারিগরী

দিচ্ছে জোড়া সারি সারি
সামনে দিছে ইলেকটারী, বাত্তি বলা যায়।
কে বানাইল কলের জাহাজ মিস্ত্রি কোথায়?
তিনশত চৌষট্টি জোড়া
মাটির জাহাজ করছে খাড়া
দুই দিকে দুই পাখার জোড়া ইঞ্জিনে ঘুরায়।
কে বানাইল কলের জাহাজ মিস্ত্রি কোথায়?
বেপার তেজারতের আশে
দেশ ছাইড়ে আইলাম বিদেশে
সব হারাইলাম কপাল দোষে
রংপুরের দিল দরিয়ায়।
কে বানাইল কলের জাহাজ মিস্ত্রি কোথায়?
উসমান গনি ভেইবা বলে
খাইল জাহাজ মায়া জলে
বিপাকে ফেলে জাহাজ সারেঙ নাইম্যা যায়।
কে বানাইল কলের জাহাজ, মিস্ত্রি কোথায়!

বাউল কবি উসমান গনি রচিত এই গানটির উপমা-রূপকগুলি খুবই উচ্চস্তরের। সেই মহান কারিগর এই বিচিত্র বর্ণের জাহাজ তৈরী করে প্রাণরূপ সারেঙকে পাঠিয়ে দিয়েছে বিশাল দরিয়ায় বাণিজ্য করতে। কিন্তু মায়ার পাকে পড়ে সব কিছুই হারিয়ে শেষে সর্বস্বান্ত হয়ে যেতে হয়। অর্থাৎ — পরকালের জীবনই মানুষের আসল জীবন। আল্লার নৈকট্যই মানুষের সত্যিকারের আশ্রয়। সেই আশ্রয় ছেড়ে মানুষ এ জগতে— এই বিদেশে আসে দু'দিনের জন্য। ঠিক যেন ব্যবসা বাণিজ্য করতে। কিন্তু দুনিয়ার মায়াজালে পড়ে সে সব কিছুই হারিয়ে ফেলে। যে উদ্দেশ্যে আসা তা আর সফল হয় না। সময় ফুরিয়ে যায়; কলের জাহাজ বিকল হয়ে পড়ে। তখন প্রাণ-রূপ সারেঙ দেহ-রূপ জাহাজকে ফেলে চলে যায় আপন দেশে। এই কবি উসমান গনি মুনশীগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তার গুরু ছিলেন মিন্নত আলী বয়াতী — যার পিতাও ছিলেন একজন বয়াতী ও সাধক পুরুষ। উসমান গনি ইসলামীভাব সম্বলিত বহু গান রচনা করেছেন।

হাসন রাজাঃ বাংলা সাহিত্যে মরমী কবি হিসেবে সিলেটের হাসন রাজার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাসন রাজার পূর্বপুরুষ ছিল হিন্দু জমিদার। তিনি জমিদারীর উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন। তাঁর আসল নাম ছিল দেওয়ান হাসন রাজা চৌধুরী। তবে শুধু হাসন রাজা বলেই তাঁর খ্যাতি সমধিক। প্রচুর বিত্তের অধিকারী হয়েও তাঁর ভাবজগতে জেগেছিল প্রচণ্ড আলোড়ন। ফলে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অর্জন করেছিলেন বৈরাগ্যসূচক দৃষ্টিভঙ্গী। তিনি ভোগবিলাসের মধ্যে লালিত জীবনাচরণের মধ্যে থেকেও পার্থিব ভোগবিলাসের অসারতা সম্পর্কে দিব্যজ্ঞান লাভ করেছিলেন। তাই তো লোক-নিন্দার কৈফিয়ত দিতে গিয়ে অনায়াস স্বচ্ছন্দে বলতে পেরেছেন—

লোকে বলে—লোকে বলে রে ঘর বাড়ী ভাল নয় আমার
কিসের ঘর বানাইব আমি শূন্যের মাঝার।
ভাল করি ঘর বানাইয়া কয়দিন থাকবো আর
আয়না দিয়া চাইয়া দেখি পাকনা চুল আমার।
এই ভাবিয়া হাসন রাজা ঘর দুয়ার না বান্ধে
কোথায় নিয়া রাখবা আল্লায় এর লাগিয়া কান্দে।
হাসন রাজায় বুঝত যদি বাঁচবো কত দিন
দালান কোঠা বানাইত করিয়া রঙ্গীন।

এই জগতে মানবজীবন চিরস্থায়ী নয়। শুধু কয়েকদিনের জন্য থাকতে এসে ভাল ঘর বাড়ী বানিয়ে জাঁকজমক করে থাকায় কি লাভ আছে? যে খোদা-প্রেমে বিশ্বাসী তার কাছে জগৎ শূন্যময়—অসার। এ জীবনও প্রকৃত জীবন নয়—প্রকৃত জীবন শুরু হবে মৃত্যুর পরে। এবং তখন তার স্থান কেমন জায়গায় হবে বিশ্বাসীর হৃদয় সেই ভাবনাতেই অস্থির। যদি হাসন রাজা জানতেন কতদিন তাকে এই পৃথিবীতে বাস করতে হবে তবেই না তিনি সুন্দর বাড়ীঘর বানিয়ে রাখতেন। হাসন রাজা প্রচুর গান রচনা করেছেন। সেগুলি হিন্দু-মুসলমান সকলের কাছেই প্রিয়। তিনি একখানা কাব্য রচনা করেন। তার নাম "হাসন উদাস'। তিনি যে একজন প্রতিভাধর কবি ছিলেন তার প্রত্যেকটি গানেই সুপরিস্ফুট। তিনি ছিলেন সব রকম সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে। এই উদার মানবপ্রেমিক মরমী কবি যে সকল গান রচনা করেছেন তার মধ্যে এমন এক অপূর্ব মর্মস্পর্শিতা

রয়েছে যা শ্রোতাকে কেবল মুগ্ধই করে না—বরং মানুষের আত্মিক পরিশুদ্ধি ঘটিয়ে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে উদাস করে তোলে। হাসন রাজা রচিত নিম্নলিখিত গানটি এক অপূর্ব কবিতা—

মাটির পিঞ্জিরার মাঝে বন্দী হইয়া রে
কান্দে হাসন রাজার মন ময়না রে ।।
মায়ে বাপে বন্দী হইলা খুশীর মাজারে
লালে ধলায় হইলাম বন্দী পিঞ্জিরার মাঝে রে ।।
পিঞ্জিরায় সামাইয়া ময়নার ছটফট ছটফট করে
মজবুত ও পিঞ্জিরা ময়নায় ভাঙ্গিতে না পারে রে ।।
উড়িয়া যাইব সোয়া পাখী পড়িয়া থাকবো কায়া
কিসের দেশ কিসের খেশ কিসের মায়া দয়া রে ।।
ময়নাকে পালিতে আছি দুধ ও কলা দিয়া
যাইবার কালে নিষ্ঠুর ময়নায় না চাইব ফিরিয়া রে ।
হাসন রাজায় ডাকবো যখন ময়না আয়রে আয়
এমন নিষ্ঠুর ময়না আর কি ফিরিয়া চায় রে ।।

কবি যে জগতের নশ্বরতা কত তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন এই গানটিই তার প্রমাণ। মানুষের এই জীবনের প্রতি কত যত্ন—কত মায়া। চারদিকে সে ভালবাসার ডালপালা বিস্তার করে নিজেকে জড়িয়ে রাখে মায়ার বন্ধনে। কিন্তু একদিন সবই শেষ হয়ে যাবে—যখন প্রাণপাখী উড়ে চলে যাবে দেহের মায়া কাটিয়ে। যে মনের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য এত আয়োজন, এত প্রচেষ্টা তা উপেক্ষা করে সে চলে যাবে অদৃশ্যলোকের আহ্বান পাওয়া মাত্র। হাজার ডাকেও সে আর ফিরে চাবে না মানুষের দেহের প্রতি। তাই হাসন রাজার মন কাঁদে এই নশ্বর, ভঙ্গুর দেহের মাঝে বন্দী হয়ে থাকতে। এই গানের মধ্যে ভাবের যে ব্যাপকতা রয়েছে তা মায়ামুগ্ধ মানবকে সংসারের সকল বাঁধন কেটে জগতের ধূলি-মলিনতাকে অতিক্রম করে আধ্যাত্মিক জগতের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

শাহনূরঃ মরমী কবি শাহনূর ছিলেন সিলেট জেলার হবিগঞ্জ নিবাসী। শাহ মঞ্জুর আলী ও চান্দ মিয়া নামে তাঁর দুইজন গুরু ছিল। এই কবি ছিলেন একজন উচ্চদরের সাধক। তাঁর হৃদয় ছিল গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ। তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

সাম্প্রদায়িক মতভেদকে প্রশ্রয় দিতেন না বলেই তাঁর অগণিত শিষ্য ছিল হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক। কবি শাহনূর সব সময় অধ্যাত্ম সাধনায় ব্যাপৃত থাকতেন এবং ভাব-তন্ময় অবস্থায় বহু গান রচনা করেছেন। তত্ত্বসম্বদ্ধ এসব গান 'নূর নছিহত' নামে প্রকাশিত হয়। তাঁর গানের ভাবসম্পদ বড় মর্মস্পর্শী। নিম্নলিখিত গানটিতে দেখা যায় কবির হৃদয় সেই চিরকালীন বিরহবেদনায় ঝুরে মরছে ঃ

বন্ধু রে প্রেমের পিয়াসী রে
বন্ধু তোর সনে পিরিতী করি
ঘরে মুই না রইতে পারি
বন্ধু রে দিবানিশি ঘুরিয়া মরি
তুই বন্ধুর লাগিয়া।
রাইত দিনে চাহিয়া থাকি পন্থ নিরখিয়া।
বন্ধু রে সহিতে না পারি দুঃখ সদায় জ্বলে হিয়া
স্বপনে গনি বন্ধু না পাই জাগিয়া।
বন্ধু রে সৈয়দ শাহনূর কয় উদাসিনী হইয়া
কি দোষে পরাণের বন্ধু না চাও ফিরিয়া।।

প্রেম-পিয়াসী কবি তাঁর প্রাণবন্ধুর সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষায় আকুল। কবি এখানে রাধার মতই প্রেমিকার ভূমিকায় অবতীর্ণ। তিনি প্রেম-পাগলিনী রাধার মতই উদাসিনী হয়ে পথপানে চেয়ে থাকেন রাত দিন। নিদ্রায় স্বপনে বন্ধুর দেখা পান কিন্তু জাগরণে পান না। সেই বেদনায় কবি আক্ষেপে বুক ভরে তুলছেন।

শাহ মোহাম্মদ ইয়াসিন ঃ সিলেটের মারফতী গান রচয়িতা আরেক জন কবি হচ্ছেন শাহ মোহাম্মদ ইয়াসিন। তিনি কয়েক হাজার গান রচনা করেছেন। এই গানের কতকগুলি "আশেকে খোদা হোব্বে রসুল" নামে প্রকাশিত হয়েছিল। এই গানগুলির মধ্যে আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনার প্রচুর খোরাক রয়েছে। তাঁর একটি গানে দেখা যায় নূর-নবী হজরত মোহাম্মদ (সঃ)এর শাফায়াতএর জন্য কাতরোক্তি।
কবি বলেছেন —

ও নবীজি তোমার দয়ার অতুল গুণেতে
পাপীরে তরাইয়া নিবানি।

আমার মত এমন পাপী এ জগতে আর আছে নি ?
ও নবীজি পাপে আমার শরীর ভরা
হইয়া রইছি জিতে মরা
জন্মভরা এমনি নিবায় নি।
দয়ার নয়ন পরশিয়া আমায় দেখা দিবায় নি।
ও নবীজি, একবার যদি দয়া কর
পাপীরে ক্ষমিতে পার—
গুণধর পাপীরে তরানি।
তোমার মত এমন দয়াল এ জগতে আর আছে নি ?
ও নবীজি সবকাত মউতের কালে,
বিষম সঙ্কটের কালে
চরণ তলে পানা দিবায় নি।।
করিম রহিম দয়াল তুমি আমাকে বাঁচাইবায় নি।।
ও নবীজি কবরেতে অন্ধকারে,
ফিরিশতায় ধরে মারে
আমি গুনাগারের খবর লইবায় নি।।
ও নবীজি হাশরের হুলুস্থুলে
'নফ্‌সী, নফ্‌সী' সবে বলে
'উম্মতি উম্মতি' বলে ফুকারিবায় নি।।
শফিউল উম্মতি হইয়া আমারে বাঁচাইবা নি।
ও নবীজি পুলসিরাতের পুলের পার
কেশের মত ক্ষুরের ধার
অন্ধকার ঘোর রজনী।
দয়া করি হাতে ধরি পার করি নিবায় নি।
ও নবীজি, হুরি নূরী, স্বর্গপুরী তাতে তোমার অধিকার
আমায় দয়া করি সঙ্গে নিবায় নি।
ইয়াসিন তোমার ভক্ত দাসেরে চরণে রাখিবায় নি।
পাপীরে তরাইয়া নিবায় নি।।

কবি ইয়াসিন নিজেকে মহাপাপী বলে বর্ণনা করেছেন। পাপীদের একমাত্র ভরসা নবীর শাফায়াত। মৃত্যুর পরে কবরে যখন শাস্তি হতে

থাকবে তখন এবং হাশরের ময়দানে যখন সবাই নিজ নিজ বিপদ উত্তরণের জন্য হাহাকার করতে থাকবে তখন নবীজি ছাড়া আর কেউ হতভাগ্যদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে না। নবীজি হজরত মোহাম্মদ (সঃ)ই একমাত্র ব্যক্তি যিনি নিজের জন্য না ভেবে মানুষের জন্য আল্লার ক্ষমা ভিক্ষা করবেন। তাই কবি কাতর হয়ে এমন মহান দয়ালু নবীর চরণ তলে আশ্রয় চাইছেন। বোঝা যায় পরকালের জীবন সম্পর্কে কবি খুব সজাগ। তাই পাপ পঙ্কিলতায় ভরা জগৎ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তিনি এমন ব্যাকুল। কবিতাটিতে রসূলের প্রতি অগাধ ভক্তি প্রকাশ পেয়েছে।

বাউলরা খুব একটা শিক্ষিত নয়। তারা অধিকাংশই নিম্নস্তরের লোক। তাদের চলাফেরাও সাধারণ অশিক্ষিত দরিদ্র লোকজনের মধ্যেই। কিন্তু তাদের গানগুলির ভাবসম্পদ যে উচ্চস্তরের তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষ করে বাউলরা নিজেদের সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান রাখে সবাই। তাদের সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও এরা সচেতন। এদের গানের মধ্যে নানাভাবে সেগুলি ব্যক্ত হয়েছে। কবি ইয়াসিনের একটি গানে দেখা যায়—

অজ্ঞান মন রে আমার অবোধ নাদান মন রে
ভুলে পড়ি থাকবি কতই দিন।
মুর্শিদ না ভজিলে তুমি, ভজবে কি আর
গেলে দিন ?
মুর্শিদ চিনি মুর্শিদ ভজ, মুর্শিদে হয় নবীর চিন্।
নবীজি চিনলে, চিনবে তুমি ওই মালেকে ইয়াওমিদ্দিন।
মনেতে গুমায় ভরা—গুমানেতে মরবার চিন্।
ছাড় বান্দা মনের ধান্দা, লাগলো আছিব দিলে জিন।
'মান আরাফা নাফসাহু' তার অন্তরে হয় একীন
'ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু' তার হাদিস হবে বিল একীন।
অন্তরে জিন্নাতের আছিব, দিল হইয়াছে সুকঠিন।
পাথরে আশার ফুল না ফুটিল কোনদিন।
নামাজ, রোজা, এবাদতে ঠিক হবে না দিল কমিন।
হবে কিসে দিল হুজুরী পৃষ্ঠেতে খান্নাসের জিন।
দৃঢ় চিত্তে মুর্শিদ ভজ, মরবে খান্নাস দিনে দিন।
খুলবে তালা আল্লা-আল্লা ফুটবে তোর আইনুল একীন।

অজ্ঞান ইয়াসিন বলে, হেলায়েতে মোর গেল দিন।
মুর্শিদ না ভজতে পারি, দিলছে নাহি গেয়া জিন।
ভুলে পড়ি থাকবি কতই দিন।

কবি বলছেন সময় থাকতেই মুর্শিদ বা গুরু ভজনা করা দরকার। কারণ গুরুর প্রতি একাগ্রচিত্ততা অর্জন করতে পারলেই নবীজিকে চেনা যাবে—তাঁর প্রতি একাগ্রতা আসবে। আবার নবীকে চিনলেই আল্লাকে চেনা যাবে—আল্লার নৈকট্য লাভের সুযোগ আসবে। সেই পরম স্বরূপকে অন্তরে ধরতে হলে একবারেই ধরা যাবে না। তার জন্য সাধনার দরকার—গুরু-অনুশীলনের প্রয়োজন। সাধনার ফলেই ধাপে ধাপে অন্তরের অন্ধকার দূরীভূত হয়। ঐকান্তিক সাধনায় জ্ঞানের বদ্ধ তালা ধীরে ধীরে উন্মোচিত হবে—অতীন্দ্রিয় আলোকে উদ্ভাসিত হবে মনের মণিকোঠা। তখনই সাধক নিজেকে চিনতে পারবে। আর নিজেকে চেনা মানেই আল্লাকে চেনা। "মান-আরাফা নাফ্‌সাহু, ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু"—ধর্মের এই বাণী সূফীদেরও পরম তত্ত্ব। তারা মনে করে সাধনার চরম পর্যায়ে সাধক নিজ অন্তরেই পরমাত্মা বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারে। বাউলদের বিশ্বাসও তাই। নিজ আত্মার মধ্যেই পরমাত্মার বাস। কিন্তু আত্মাকে না চিনলে তো পরমাত্মাকে চেনা যাবে না। তাই তাত্ত্বিক কবি ইয়াসিন নিজের মনকে তথা মানব সমাজকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন।

মুর্শিদ চিনি মুর্শিদ ভজ মুর্শিদে হয় নবীর চিন।
নবীজি চিনলে চিনবে তুমি ওই মালেকে ইয়াওমিদ্দিন।

কবি আরেক জায়গায় বলেছেন—

অবুঝে কি বুঝতে পারে আকবরী সোনা?
তামা কাঁসা পিতল সোনা চার চীজে এক নমুনা।
দুনিয়া জোড়া পাখির সীমা নাই
কাউয়ার মুখে ময়নার বুলি শুনছোনিরে ভাই।
কাউয়া কোকিল ময়না কালা আর কালা ফেচকুনা।
ভবে ফুটে নানান জাতির ফুল।
সকল ফুলে বসে কি রে ভোমরা বুলবুল?
তুমি বকুল ফুল তুলতে গিয়া জারমানি ফুল তুলিও না।

ভুবন জুড়ি সীমা পাই
সকল দরক্তে আগর চন্দন মিলেনি রে ভাই?
তুমি আগর বলে শেওড়া গাছে কুড়ালখানা ভাঙ্গিও না।

যারা অবুঝ—জ্ঞান-চক্ষু যাদের বন্ধ তারা তামা-কাঁসা-পিতলের ও সোনার পার্থক্য বুঝতে পারে না। তারা বুঝে না যে, জগতে কত বর্ণের ফুলই তো ফোটে। কিন্তু সব ফুলেই ভোমরা বসে না। সুতরাং সব কিছুর মধ্য থেকে আসল রত্নটিকে খুঁজে নেবার ক্ষমতা থাকা চাই। ভুল করে বাজে জিনিসটিকে বেছে নেওয়া উচিত নয়—এই কথাটাকে বুঝাবার জন্য কবি সুন্দর উপমা দিয়েছেন—

"তুমি বকুল ফুল তুলতে গিয়া জারমানি ফুল তুলিও না"

জানি না এই 'জারমানি' ফুল আবার কেমন ফুল! তবে এটা ঠিকই বোঝা যাচ্ছে যে গুণগত দিক দিয়ে এই 'জারমানি' ফুলটি বকুল ফুলের অনেক নীচে। যে সুগন্ধ মনকে অনাবিল আনন্দে ভরে তুলবে সে ক্ষমতা এর নেই। সব গাছেই কি চন্দনের সুগন্ধ মেলে? সুতরাং শেওড়া গাছের কাছেও যদি চন্দনের উপকারিতা আশা করা যায় তবে তা ভুল হবে। সহজ সরল ভাষায় কবি এমন উপমা ব্যবহার করেছেন—যার মধ্যে রয়েছে সরস সাহিত্যিক উৎকর্ষিতা। এই উপমার সাহায্যে কবি সঠিক ব্যক্তিকে গুরু হিসেবে চিনে নেবার কথাই ব্যক্ত করেছেন।

॥ ৪ ॥

চর্যাপদ রচয়িতা সিদ্ধাচার্যরা ধর্মের ছকবাঁধা কঠিন গণ্ডীর মধ্যে কখনও পদচারণা করেন নাই। বাউলদের মধ্যেও সেই ভাবের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। তারাও আনুষ্ঠানিক ধর্মাচার বা শাস্ত্রের বিধিবদ্ধতাকে জীবনে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে মনে করে নাই। তারা নিজেদের সহজ বিচারবুদ্ধির দ্বারা যা করণীয় বলে উপলব্ধি করেছে—তাই পালন করেছে। এজন্য দেখা যায় বাউল গানে অনেকেই 'বেদ-বেদান্ত' বা শাস্ত্রাচারের প্রতি বক্র ইঙ্গিত হেনেছে। সাধারণভাবেই মানুষ বিশ্বাস করে তীর্থযাত্রায় পুণ্যলাভ হয়। কিন্তু এই ধরনের বিশ্বাসও বাউলদের নাই।

মক্কা-মদীনাই বল আর কাশী-বৃন্দাবনই বল—সবই মানুষের জন্য তৈরী, সবখানেই মানুষেরই জয় জয়কার। এ যেন সেই চণ্ডীদাসের কথাই—

> "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

কবি জালাল চাঁদের একটি গানে এই ভাবের সুন্দর বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। কবি জালাল বলেছেন—

খোদা নাইকো কোনখানে
জনম ভরে দেখলাম খুঁজে
পাই না কিছু এই মানুষ বিনে।
মক্কা আর মদীনাতে, আজমীর আর বোগদাদে
সেখানে নেই কোন খোদা দেখছি জেনে শুনে।
কত লোক তার গিয়াছিল জিয়ারত কারণে।
কত আল্লার শিরনী তৈয়ার হলো
খায় না তাহা মানুষ বিনে।
শ্রীক্ষেত্র বৃন্দাবনে, নবদ্বীপ আর কাশীধামে,
যেখানে নাইকো খোদা শুধু মানুষ বিনে।
নবদ্বীপে এক ভোগ সাজালো, মুক্তি খোদাই জেনে।
তার কত প্রসাদ তৈয়ার হলো
খায় না তাহা এই মানুষ বিনে।
অধীন জালাল চাঁদে বলে, দেখ না মন দলীল খুলে
খালাকা আলম সুরাতে লিখেছে কোরানে
মানুষ রূপে আল্লার বায়াম, আলেমে তা জানে
তারা নিজের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে
সত্য কথা বলবে কেনে?

মানুষ পুণ্য অর্জনের আশায় মক্কা-মদীনায় যায়—বৃন্দাবন, নবদ্বীপ আর কাশীধামে যায়। সেখানে আল্লার নামে কত শিরণী তৈয়ার হয়—ঈশ্বরের নামে প্রসাদ তৈরী হয়। কিন্তু সেগুলি আল্লাহ, ঈশ্বর, দেবতা, কেউই গ্রহণ করে না। গ্রহণ করে মানুষ। আল্লাহ বা ঈশ্বরের নামে তৈরী জিনিসে যদি মানুষেরই অগ্রাধিকার, তবে আর দূর দূরান্তে মক্কায় বা বৃন্দাবনে দৌড়িয়ে কি লাভ? খোদা মানুষের মধ্যেই আছেন। মানুষের সেবাতেই খোদা খুশী। তাতেই পুণ্যার্জন হয়। সুতরাং মানুষের উচিত নিজের

মনের বিশ্লেষণই আগে করা। মানুষের আত্মাই সকল রহস্যের আধার এ বিষয়ে প্রত্যেক বাউলই একমত।

আরকুম: আমরা আরকুম বলে একজন কবির সাক্ষাৎ পেয়েছি। ইনি ভনিতায় নিজেকে সব সময়ই 'পাগল আরকম' বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্য বাউলদের লোকে এমনিতেই পাগল বলে থাকে তবে মনে হয় কবি নিজেকে পাগল বলেছেন—আল্লার পাগল, মনের মানুষের জন্য পাগল—এই অর্থে। এই কবি ১৮৬০ সালের দিকে সিলেট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বহু মারফতী গান রচনা করেছেন। ''হক্বিকতে সিতারা'' নামে তার একটি পুঁথি ছাপার অক্ষরে পাওয়া গেছে। কবির 'পাগল নাম সার্থক। কারণ তার প্রত্যেকটি গানেই তার প্রেম-পাগল হৃদয়ের আকুতি অতি সুন্দর ও প্রাণস্পর্শীরূপে ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর একটি গান নিম্নরূপ:

মিম রে জিম নূ—আমার চক্ষেরই রতন রে—
পাই না দরশন।

আলিপ রে কাপ মিমের যতনের ধন।
দুই দেহাতে এক জনাতে লাগাইয়াছে খেলা।
প্রেমরসে কল্‌ব খসে উলটা পেঁচের তালা।
অগ্নিজোরে চরকি ঘুরে না যায় সহন।
আশেক জ্বলিয়া মরে মাশুকের কারণ রে।
প্রেম করিয়াছে জলে মীনে জানা সর্বস্থানে:
জল ছাড়া মীন কভু বাঁচে না পরাণে।
প্রিয়া ছাড়া ভিন্ন হয় আশেক যখন
বাতুনীতে বন্ধু ঢুঁড়ে বুঁজিয়া নয়ন রে
এশকের কামাল ॥

তীর লাগছে বুকে যার।
কলিজা তার হইয়াছে অঙ্গার॥
কেহ না পারবে তারে করতে নিবারণ।
প্রিয়া দরশন বিনে না যায় মিটন রে।
পাগল আরকুমে কয় প্রেম করিয়াছে যারা
কখন সে জিতা থাকে কখন সে মরা।
আশেক মাশুকের ভেদ জানে নিরাঞ্জনে
যার খেলা সেই খেলে কলঙ্কিনী তন রে।

মাছ ও পানিতে প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে বলেই পানি ছাড়া মাছ বাঁচে না। তেমনি প্রেমিকা বা আশেকও তার মাশুকের দেখা না পেয়ে জীয়ন্তে মরা হয়ে থাকে। যার বুকে প্রেমের তীর বিদ্ধ হয়েছে, হৃদয় তার জ্বলে অঙ্গার হয়ে গেছে। মাশুকের দেখা না পেলে এ জ্বালা জুড়াবার নয়। কবির মতে যারা প্রেমের শিকার হয়েছে তাদের জীবন মরণ সব একই প্রকার।

বাউলেরা মনে করে মানুষের আত্মা ঠিক দর্পণের মত। দর্পণ ময়লা হলে তাতে আর প্রতিবিম্ব পড়ে না। তেমনি আত্মাও যদি জাগতিক কামনা বাসনা-ক্ষুদ্রতা ও হীনতার দ্বারা মলিন হয় তবে তাতে আর পরমাত্মার ছায়া পড়ে না। সুতরাং পরমাত্মাকে পেতে হলে আত্মায় তাঁকে প্রতিবিম্বিত করতে হলে সাধনার দ্বারা যোগের দ্বারা সেই মালিন্য দূর করতে হবে; হৃদয়কে করতে হবে ফটিকস্বচ্ছ। তবেই মানুষ পরমাত্মাকে দেখতে পাবে আপন আত্মায়। আসলে আত্মা আর পরমাত্মা তো অভেদাত্মক। একদেহে দুই জনের বাস। শুধু দৃষ্টির অস্বচ্ছতার কারণেই আমরা তাকে দেখতে পাই না—সিদ্ধি লাভ করতে পারি না। এই অস্বচ্ছতা দূরীকরণের প্রচেষ্টাই হচ্ছে বাউলের সাধনা। কবি আজিজের রচিত এই গানটিতে ‘‘অভেদ তত্ত্ব’ সুন্দর রূপে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন—

পাগলী আমায় পাগল করেছে
পাগল করেছে আমায়— জ্যান্তে মরা হয়েছে
সে আমার আমি তার, কে আমার বল কার
তাহাতে রয়েছি আমি, সে আমাতে রয়েছে।
দুই নয় সে একই দুই
ভবে যে ভাবে দুই
তার ইহকাল পরকাল গেছে দুই।
সে দুয়ে দুই, দুই হয়েছে।
সবে বলে ‘হু হু’
বল কোন্ ‘হু’ আমার ‘রুহু’
আব-আতশ-খাক-বাদেতে ‘হু’
সব ‘হু’ হু-রেতে মিশেছে।
‘‘উলুহিয়াত, রবুবিয়াত
গঞ্জে-মখ্‌কি আবুদিয়াত’’

তিন হু-য়েতে আলিফ-লাম-মিম
সবেতে আলিফ হয়েছে ।।
এন্‌সান—রহমান—আর শয়তান
তিনে করে তিনের ধিয়ান
একেতে তিন—তিনেতে এক
তিন মিলে এক হয়েছে ।
মান আরাফা নাফ্‌সাহু
ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু
কোরানে ফরমালেন আপে
যে পারে সে চিনেছে ।।
এই কথা যে বলে মিথ্যা
তার ইহকাল পরকাল মিথ্যা
তার জন্ম মিথ্যা সকল মিথ্যা
সে মিথ্যা সেজে রয়েছে ।।
আজিজ বলে ভাব রে মন
আগে চেন আপনার জন
পিতামাতা নয় রে আপন
আপনায় আপনি রয়েছে ।।

পরমাত্মা যে আত্মার মধ্যেই থাকে — মানুষের হৃদয়ই যে ঈশ্বরের আসন এই কথাটাই কবি আজিজ বার বার বলেছেন। এর জন্য আগে নিজেকেই চেনা দরকার। যে নিজেকে চিনেছে, সেই চিনতে পারে আল্লাকে — সুফী তত্ত্বে এই মূলমন্ত্রটিকে অন্যান্য বাউলদের মত কবি আজিজও সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করেন।

পাগলা কানাই: আধ্যাত্মিক গান রচয়িতা হিসাবে কবি পাগলা কানাইর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রচনা শক্তি ও খ্যাতির দিক দিয়ে এই কবিকে লালন ফকিরের সঙ্গে তুলনা করা চলে। কোন কোন ব্যাপারে লালনের চেয়েও বেশী পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন ইনি। যেমন — লালনের গানে কেবল বাউলতত্ত্বের বিভিন্ন দিকেরই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পাগলা কানাই লিখেছেন বিভিন্ন ধরনের গান। মূলতঃ তিনি বাউল — আধ্যাত্মিক সাধনাই তাঁর জীবনের ব্রত। কিন্তু

তাঁর রচনায় সমাজের বিভিন্ন দিকের পরিচয়ও বিধৃত রয়েছে। তিনি যে সমাজ-সচেতন ছিলেন, সে বিষয়ে স্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর কবিতায়। পাগলা কানাই যশোর জেলা ঝিনাইদহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম তারিখ……………… ………।

আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন পাগলা কানাই লেখাপড়া শিখতে পারেন নি। অল্প বয়সেই তিনি পিতার সঙ্গে কৃষিকার্যে যোগ দেন। কিন্তু ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে যে এই অশিক্ষিত গ্রাম্য কবির অন্তর থেকে কী ঐশ্বর্যমণ্ডিত কথা বেরিয়ে এসেছে সুরের পাখায় ভর করে। তাঁর গানের মধ্যে এমন এক মাদকতা ছিল যার জন্য অগণিত শ্রোতা ভক্তি ও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেত। ফলে তিনি যেখানেই গেছেন, সেখানকার লোকেরাই তাঁকে তাদের অঞ্চলের লোক বলে দাবী করেছে। এটা তাদের প্রাণের দাবী। এতেই বোঝা যায় মানুষের মনের জগতে পাগলা কানাইএর আধিপত্য ছিল কত ব্যাপক। তিনি গানের কথা দিয়ে, সুর দিয়ে শ্রোতাদের হৃদয় জয় করে ফেলেছিলেন। তাঁর গানের ভাব যেমন উচ্চ-স্তরের—সুরও তেমনি বিচিত্র। তিনি পার্থিব সম্পদে বঞ্চিত ছিলেন বটে কিন্তু খোদা তাঁকে দিয়েছিলেন অফুরন্ত অন্তর-সম্পদ। এই ঈশ্বর-প্রদত্ত সম্পদের দ্বারা তিনি কালজয়ী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পাগলা কানাই অজস্র গান রচনা করেছেন। তার মধ্যে বাউল, মারফতী, 'মুর্শিদী' ও দেহতত্ত্বমূলক গানই প্রধান। এই গ্রাম্যকবির জীবন-চেতনা ছিল প্রখর। তাই মানুষের হৃদয়ের চাহিদা পূরণ করতে পেরেছিলেন নিজ অন্তরের অমৃত সিঞ্চনে, বিশেষ করে গ্রাম্য মানুষের চাহিদা। গ্রামের সাধারণ মানুষ দিনান্তে পরিশ্রমের ক্লান্তি ঘোচাতে যায় গান শুনতে। কিন্তু সে গান শুধু গানই নয় — মানুষের পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে, এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের অসারতা সম্বন্ধে যদি কিছু শুনায়, তবেই সাধারণ মানুষের আকর্ষণ বাড়ে সেই গানের প্রতি। কারণ — আধ্যাত্মিক পিপাসা যে মানুষের চিরন্তন। মানুষের এই পিপাসাই চরিতার্থ করেছেন পাগলা কানাই তাঁর গানের যাদু স্পর্শে। গ্রামের সহজ অনাড়ম্বর জীবনে — লোকের সরল বিশ্বাসের কাছে আল্লা-রসুল, ইহকাল-পরকাল প্রভৃতি বিষয়ক গানগুলি যেন ছিল এক অমল ভক্তিরসের উৎস। পাগলা কানাই অবলীলাক্রমে সকলকে এই রসের জোগান দিয়ে গেছেন।

কবি ছিলেন সাধক-দরবেশ। শুনা যায় কোন এক সুফী দরবেশের কাছে তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কবিতায় গানে সেই সাধনার গভীর পরিচয় রয়েছে। পাগলা কানাই যেযুগে জন্মগ্রহণ করেন, সে যুগে প্রায় সকল কবির উপরেই পড়েছিল সুফী প্রভাব। এদেশে সুফীরা যে কেবল ধর্ম প্রচারই করেছিলেন তা নয়, হৃদয়ে, হৃদয়ে, সংযোগ সাধনের কাজটও তারা করেছিলেন সার্থক ভাবেই। তাঁদের সেই কর্মের সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছিল পাগলা কানাইর জীবনেও। তিনিও তাদের ধ্যান ধারণার দ্বারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তাই তাঁর জীবনে ও কর্মে পড়েছে আধ্যাত্মিকতার ছাপ। অন্যান্য বাউল সাধকদের মতই কবি পাগলা কানাইও গুরু বা মুর্শিদ ধরেই সাধন ভজন করতে চান। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছেন মুর্শিদ ছাড়া সিদ্ধি লাভের উপায় নাই। তাই কবি বলেন—

গুরু ভজব বলে ছিল বাসনা
আমি পারলাম না রে ভাই
আমি দিন থাকতে মুর্শিদ ধরে
সাধন ভজন করতে চাই।
কাওড়া লাগায় মদন চাঁদ গোঁসাই।
আমি কাজে মাতাল হয়েছি বেতাল
আরও চৌতালে বেড়াই।
আমি চোরের দেশে করি বসতি
ও সদায় শিং কাটে ঘরে।
ওরে মদনা বেটা দুষ্ট ভারি
প্রাণ কাঁদে তাহার ডরে।
আমি সাধন ভজন করি কেমন করে।
গুপ্ত তলে চোরের অধিকার
ও তারে ধরি কেমন করে।
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মায়া
ও যার অন্তরেতে নাই।
তারই হচ্ছে সাধন ভজন
এই অধীনের শক্তি নাই।
মিছে চাটকী চাটাম করিয়া বেড়াই।

পাগলা কানাই বলে তাই মিছে খটখটি
ও দেশে বিদেশে ঘুরে পেট বাঁচাই।

সময় থাকতেই মুর্শিদের পদাশ্রয় করে সাধন ভজন করার বাসনা থাকলেও কবি সফল কাম হচ্ছেন না। কারণ হৃদয়ে প্রবৃত্তি বড় প্রবল। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মায়া এই পাঁচ ইন্দ্রিয় যে দমন করতে পারবে সে-ই সাধন ভজনের উপযুক্ত। কিন্তু কবি এখনো সে শক্তি আয়ত্ত করতে পারেন নাই। তাই তিনি আফসোস করছেন। কবি জানেন জীবন নশ্বর। মিছে 'চাটকি চাটাম, অর্থাৎ মিথ্যা বাহাদুরি করে বেড়ালে কি হবে? সব আস্ফালন সব অহঙ্কার মাটিতে মিশে যাবে মৃত্যুর সাথে সাথেই। তাই কবি মনকে জীবনের বেলা থাকতেই সাবধানবাণী শুনাচ্ছেন:

পাগলা কানাই বলে গানের তালে
ঠেকবি রে মন কালাকালে এই না মায়ার জালে
ও তুই ভবে এসে রইলি বসে
চিনলি না মন আল্লা রসুলে।
তুই দেখ রে নয়ন মেলে
আর হবে না সাধের জনম পাবি না দিন গেলে।
গেলে দিন আর হবে না
দিনকানা কাচ ধরিস মানিক ফেলে।
ও যেদিন ধড় ছাড়িয়া মালেক যাবে উড়ে
খালি দেহ পইর‍্যা রবে এই ভবের বাজারে।
সে যে মাতাপিতা কন্যা কেউ চাবে না ফিরে
ও নিবে যমুনার তীরে।
সোনার অঙ্গ দিবে পুড়া না হয় দিবে কবরে।
দয়া হবে না ধড়ে
দেহ থাকতে মন হও রে চেতন
ভুল করলে হারাবি সব ধন।
যার কর রায়তগিরি
দেও না তার মাল গুজারি
আসল করলা চুরি
আদালতে আরজি দিয়ে করবে ডিগ্রী জারি।

ও রে তোর সমন আসবে বাড়ি
মাল কোরকের পেয়াদা আইস্যা হাতে দিবে দড়ি।
সকল ধন লুইট্যা নিবে
ও শূন্য হবে তোর পুরী।।

সত্যি মরণের সমন যেদিন এসে যাবে সেদিন আর কোনক্রমেই ফাঁকি দেওয়া চলবে না। প্রাণপাখী চলে যাবে পড়ে থাকবে শূন্য খাঁচা। সেদিন মাতা-পিতা-কন্যা কোন প্রিয়জনই আর ফিরেও তাকাবে না। এত যত্নের সোনার দেহ নিয়ে পুড়িয়ে ফেলবে কিম্বা রেখে আসবে কবরের অন্ধকার গহ্বরে। এই যদি মানুষের ভবিতব্য তবে কি আগে থাকতেই সতর্ক হওয়া উচিত নয়? সুতরাং জীবন থাকতেই যার কৃপায় এই জীবন সেই আল্লার প্রতি সচেতন হতে উপদেশ দিয়েছেন কবি। কি চমৎকার উপমা দিয়েছেন পাগলা কানাই— "দিনকানা কাচ ধরিস মানিক ফেলে!" সত্যিই যে দিনকানা সে চক্ষু থাকতেও তুচ্ছ কাচ ও মানিকের পার্থক্য বুঝতে পারে না। সাধের জীবন বয়ে যেতে দেয় অকাজে কুকাজে। তাই--

পাগলা কানাই কয় ওরে অবুঝ মন
আমার মন রে রসনা
তোমার আজ ম'লে কাল দু'দিন হবে
এভাবে দিন যাবে না,
চেয়ে দেখ রে দিনকানা।

সুতরাং জীবনপথের সম্বল অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে। মহাজনের কাছে যেয়ে একদিন না একদিন হিসাব কড়ায় ক্রান্তিতে বুঝিয়ে দিতে হবে। তখন ধরা পড়বে সব ফাঁকি। তাই কবি মনকে মুর্শিদ ধরে সাধন ভজনে ব্রতী হতে বলেছেন—

ভব পারে যাবি রে অবুঝ মন
ও আমার মন রে রসনা।
দিন থাকতে মুর্শিদ ধরে সদা ভজন করলে না।
ও পরকালের চেষ্টা করলে না।
দিনে দিনে দিন হল গত চেয়ে দেখ রে দিনকানা।
দেহের বাদী রিপু ছয় জন আগে বশ কর তারে
ঐ নাম ভুললে পরে পড়বি ফেরে
প্রাণ যাবে হীরার ধারে।

পুলছেরাত পার হবি কেমন করে ?
ও দায় মালিচোর ওরে গঁাজাখোর
আর কত বুঝাবো তোরে ।
তাই পাগল বলে ও আমার অবুঝ মন রে রসনা ।
আমি বারে বারে বলছি তোরে কর পারের ভাবনা ।
তোমার দিনে দিনে দিন ফুরায়্যা গেল
ও তাই কর সাধনা ।।

এই যে কবি 'দিনে দিনে দিন' ফুরিয়ে যাচ্ছে বলে মনকে সাধনার কথা বলছেন -- এ হচ্ছে মনের মানুষকে পাবার সাধনা । যেদিন সাধনায় সিদ্ধি লাভ হবে, সেদিন মনের মানুষকে পাবে সাধক — পরমাত্মার সঙ্গে মিলে যাবে জীবসত্ত্বা । পাগলা কানাইর ক্রন্দন ও ব্যাকুলতাও তো সে মনের মানুষের জন্যই । কিন্তু মনের মানুষকে পেতে হলে দেহতত্ত্ব আগে জানতে হবে । দেহ-জমিন আবাদ করলেই তো সোনার ফসল ফলবে—হাতে আসবে অধর মানিক । কবি বলেন—

একটা কথা শুধাই তোমায় ওরে আমার মন-চাষা
তুমি কেন হলে বুদ্ধির নাশা — সর্বনাশা ।
এই মানব-জমি আবাদ করলে না
তাই হলো তোমার দুখ্‌দশা ।
তুমি ধান না বুনে বুনলে চিনা
বছর ভরে খাবে কিইন্না
নাই তোমার কোনই ভরসা ।
তা থুইয়া ছয় বলদে হাল জুড়িয়া রে
মারো সেই জমিনের বাকখা ।
আরো ষোল পোয়া জমিখানি
আড়ে দীঘে নাই বেশী কমী
দেখতে বড়ই খাসা ।
ও তার মাঝখানে এক 'বরুজ' আছে রে
তার কুমপুনী মহারাণী
জমিনের দস্তি আছে বরাটা তারা লাগায় লেঠা

আর আছে মদনা বেটা।
তাই পাগলা কানাই ভেবে বলে রে
ও দিন থাকতে জমি আবাদ করলে না।
ও ফসল ডোলে তুলবে না।

মরমী সাধনার মূলকথাই হচ্ছে দেহতত্ত্ব জানা। কারণ এই দেহের মধ্যেই পরমাত্মার বাস। আবার দেহের মধ্যেই রয়েছে যত অকাজ কুকাজের সঙ্গী—ছয় রিপু। মানবদেহ জমিন তুল্য। এই দেহ-জমি আবাদ করে আগে দেহকে আয়ত্তে আনতে হবে। এবং সময় থাকতে তাতে ফসল বুনতে হবে অর্থাৎ সাধন-ভজনে লিপ্ত হতে হবে।

কবি মানব দেহকে কখনো জাহাজ, কখনো নৌকা, কখনো রথ আবার কখনো বা ঘরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। নিম্নলিখিত দেহতত্ত্বমূলক গানটি কবির প্রতিভার অমর স্বাক্ষর বহন করছে--

আজব এক জাহাজ গড়ে
দীনবন্ধু পাঠাইছেন ভবের পরে
সে জাহাজ পানিতে কখনো চলে না
শুকনা ভেসে ফেরে।
দীন-বন্ধু জয়-সিন্ধু মন মাঝি হাল ধরে।
জাহাজ চলত্যাছে তাই দুই দাঁড়ে।
একি আজব কল—
শুকনাতে ভাইস্যা ফেরে তার মধ্যে জল।
জাহাজের মধ্যে আগুন পানি
বোঝাই তাতে মূল্য মাল।
হাল ছাড়ো না ও ভাই মাঝি
ঠিক সামাল সামাল
তরী কখন যেন হয় না তল।
জাহাজের আট কুঠুরী, নয় দরজা
মাল কোঠায় সোনা।
যদি দাড়ি মাল্লা ছয়জন রিপু জাহাজ চালায় না
তবে, জাহাজের কি হবে ?
পাগলা কানাই বসে এখন তাই ভাবে।

যেদিন জাহাজ হবে কমজোরী ভাই
বান খেয়ে তরী জল নেবে
দাঁড়ি মাল্লা ছয়জন রিপু সব ছেড়ে যাবে।
সেদিন শুকনায় তরী তল হবে।

কবি মানব দেহের গঠন সম্পর্কে বলেছেন। এই দেহ যেন এক জাহাজ। কিন্তু এ জাহাজ পানিতে চলে না, চলে শুকনায়। মনমাঝি এর হাল ধরে আছে। খুব সতর্ক হয়ে তাকে জাহাজ চালাতে হবে। নইলে যদি ছয় রিপুর হাতে পড়ে তবে এ জাহাজ কমজোরী হয়ে পড়বে। সংসার সমুদ্রের প্রবল বন্যায় হবে তার ভরাডুবি। তাকে বিপাকে ফেলে দাড়ি মাল্লা-রূপ ছয় রিপু তখন ভেগে যাবে। সুতরাং মনকে হাল খুব শক্ত হাতে চালাতে হবে।

কবি একদিকে সুফী ভাবাপন্ন বাউল — অন্যদিকে খাঁটি মুসলমান। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী চলাকে তিনি অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করেন। সারা জীবন তিনি রীতিমত নামাজ রোজা করেছেন। কবি লালন শাহের সঙ্গে এইখানে তাঁর পার্থক্য দৃষ্ট হয়। শোনা যায় লালন শাহ্, জীবনেও নামাজ পড়েন নাই। এজন্য তৎকালীন সমাজে তাকে 'বেশরা' বলে অভিহিত করতেন মোল্লা-মুছুল্লীরা। কিন্তু পাগলা কানাই পারত পক্ষে কোনদিন নামাজ বাদ দেন নাই। এমনকি গানের আসরে বসেও যদি সময় হয়েছে তবে নামাজ পড়ে নিতেন কবি। নামাজ-রোজা তথা ধর্মের প্রতি এই অচলা ভক্তির পরিচয় রয়েছে তাঁর গানের মধ্যে। ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠ হতে কেবল নিজের মনকেই বলেন নাই—বলেছেন সকল মুসলমানকেই—

পড় রাব্বিল আলামীন যত মোমিন মুসলমান
তোমরা ঠিক রাখো ঈমান।
সংসারের পর সারিয়া চলো
ঘটবে যেদিন তুফান।
ভয় রাখো ভয় রাখো বলে ওরে মন
ডাকতাছে মালেক ছোবহান।
অপার মহিমা যাহার
সে বড় করনেআলা কুদরতে বাহার।
গেল দিন শুন মুসলমান মোমিন
পড় রাব্বিল আলামীন

দিন গেলে কি পাবি ওরে দিন
দীনের মধ্যে প্রধান হলো মোহাম্মদের দীন।
সেই দীনের দীন করলে একীন
সুখে রবি চিরদিন।
নাইকো জালা ও মন ভোলা
পাবি রে পার হাশরের দিন।
তুই পুলসিরাত হবি যদি পার
তিরিশ মতি পঞ্চ মানিক সঙ্গে পুঁজি কর।
কত ফকির, বৈষ্ণব, আলেম, ফাজেল
তারা পুঁজি করছেন বহুতর।
আমি কানাই সুপথে নাই
কি যেন করেন পরওয়ার।
ভোলা মন তাই বুঝে কর কারবার।।

গানটিতে 'তিরিশ মানিক' বলতে তিরিশ রোজা এবং পঞ্চ মতি বলতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকেই বুঝিয়েছেন কবি। নামাজ রোজাই জীবনের শেষ সম্বল, যা নিয়ে মহাবিচারের দিন পার হওয়া যাবে পুলসিরাত। ঈমান বা বিশ্বাস ঠিক রেখে দিন থাকতেই ধর্মে-কর্মে মন বসাতে উপদেশ দিচ্ছেন কবি। সকল ধর্মের মধ্যে ইসলাম ধর্মই যে প্রধান তা বুঝেই কবি মনকে সুপথে চালিত হতে বলেছেন। অনেক কবিতার মধ্যেই তিনি ধর্মাচরণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। এই ধর্মচেতনা জেগেছে মৃত্যুভয় থেকেই। যার মনে মৃত্যুভয় আছে সে কখনো কুপথে যেতে পারে না। জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বের উপলব্ধিই কবিকে আধ্যাত্মিক সাধনার পথে একাগ্রতা এনে দিয়েছে।

।। ৫ ।।

আমাদের মরমী সাহিত্যের আর এক উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে 'মাইজ ভাণ্ডারী' গানগুলি। মাইজভাণ্ডার চট্টগ্রামের একটি গ্রামের নাম। চিশতিয়া তরীকার মারফতি ফকিরদের এটি একটি প্রধান কেন্দ্র। এই

বাংলাদেশে এই তরীকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পীর মওলানা আবদুল কুদ্দুস। তিনি সুফী মতাবলম্বী আলেম ছিলেন। তাঁর অনেক ভক্ত ও মুরীদ ছিল। এই পীরের দরবারে সব সময় আল্লার জিকির করা হোত। অগণিত ভক্ত-শিষ্য এই জিকিরে অংশ নিত। জিকিরের সঙ্গে সঙ্গে তাল-মান ঠিক রেখে গান-বাজনারও প্রচলন আছে। শুধু তাই নয়, অনেকে গানের তালে তালে নৃত্য শুরু করে দেয়। এ সময়ে তাদের কোন বাহ্যজ্ঞান থাকে না। নৃত্যগীত সম্বলিত এই ধরনের জিকিরকে বলে "হালকার গান"। চিশতিয়া তরীকার সাধনায় গান-বাজনা অবশ্য প্রয়োজনীয়। গান-বাজনার তালে তালে নৃত্যরত অবস্থায় আল্লার ধ্যান করার প্রথা দেখা যায় মধ্য এশিয়ার সুবিখ্যাত সাধক সুফী হযরত জালালুদ্দিন রুমীর অনুসারীদের মধ্যে। তাঁরা বিভিন্ন ভঙ্গীতে নেচে নেচে আল্লার ধ্যানে তন্ময় হয়ে পড়েন। গানের মধ্যে এমন শক্তি আছে যার দ্বারা মানুষকে বশীভূত করা যায় মনের কু ভাব দূরীভূত করে সেখানে সুভাবের উদয় হয়। হয়ত এসব সাধকদের ধারণা গানের সুমোহন মন্ত্রের দ্বারা তাদের হৃদয়ের কালিমা অপনোদন করে ফেললেই সেখানে ঐশী আলোক উদ্ভাসিত হবে — দেখা দিবে পরম প্রার্থিত মনের মানুষ বা পরমাত্মা। মাইজ ভাণ্ডারী ফকিররাও এই ধারণারই বশবর্তী।

চট্টগ্রামের মাইজ ভাণ্ডার এই গানের উৎপত্তিস্থল হলেও বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলেও এর যথেষ্ট জনপ্রিয়তা রয়েছে। এবং এ ধরনের গানের রচয়িতাও রয়েছে। এই গানের মধ্যে আল্লা-রসুল ও পীর-মুর্শিদের কথাই বলা হয়েছে। বাউলদের মতই ভক্ত সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে মুর্শিদের দয়া ভিক্ষা করছে কিম্বা মারফতী তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছে।

ঢাকা জেলায় রাজারপুর গ্রামের সফিউদ্দিন বাউল মাইজ ভাণ্ডারী পীরের শিষ্য ছিলেন। তিনি অনেক গান রচনা করেছেন। এক সময়ে বাজারে তার কয়েকখানা পুঁথিও চালু ছিল। সে পুঁথিগুলির নাম যথাক্রমে 'তুষের আগুন', 'প্রেমাগুন', 'রাজভাণ্ডার' ইত্যাদি। নিম্নলিখিত গানটিতে কবি প্রেমিক সাধককে ডুবুরীর সঙ্গে তুলনা করেছেন ঃ

ডুবারুগণ মোতি ধরে ডুইব্যা দরিয়ায়।
ডুবারু না হইলে মোতি ধরা বিষম দায় ।।
প্রেম নদীতে ডুবারু যারা,

নদীর গভীর চিনে তারা
দম ধরিলে যায় না মারা, কুম্ভীরে না খায় ।।
করে নদীর ডুবারু সনে,
ষটচক্র ভেদ না জানে
ডুব দিলে নদীর উজানে, ভাটি দিয়া যায় ।।
মোতির ঝিনুক না চিনিলায়,
পড়ে থাকে কিবা যায়
মুরগী ডিম রেখে বাসায়, বাহিরেতে করকরায় ।।
যে ঝিনুকে মোতিমাল,
খাইতে পারে তা বড় হালাল
যে সাপেতে আছে লাল, ঐ সাপে কারে খায় ।।
লিখেছে গান সফিউদ্দি
বুঝ কর যার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি
ফকির না হয় খাইলে সিদ্ধি, সাধু না হয় মোট মালায় ।।

সমুদ্র থেকে রত্ন খুঁজে আনা বড় সহজ কাজ নয় । নদীর কোন্ গহীনে মোতি থাকে তা অভিজ্ঞ ডুবারুই জানে । কঠিন সতর্কতার সঙ্গে সে সব বিপদ অতিক্রম করে রত্ন নিয়ে আসে । তেমনি যে প্রেমের পথের পথিক--যে মনের মানুষরূপ রত্নকে পেতে চায়, তাকে সাধনা করতে হবে । কারণ সাধক সাধনার বিভিন্ন তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান রাখে । তাই তার পথভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই । এখানে কবি যোগ সাধনার কথা বিশেষভাবে বলেছেন—"দম ধরিলে যায় না মারা, কুম্ভীরে না খায় ।" কেবল বাইরের খোলসটাই যে প্রকৃত সাধকের পরিচয় নয় তাও কবি বলেছেন — "ফকির না হয় খাইলে সিদ্ধি, সাধু না হয় মোট মালায় ।" অর্থাৎ সিদ্ধি খেয়ে নেশা করলেই প্রমাণিত হয় না যে সে সত্যিকারের তত্ত্ব-সন্ধানী ফকির কিম্বা গলায় কাঠের মালা পরে থাকলেও প্রমাণ হয় না যে সে সাধু দরবেশ । প্রকৃত সাধকের পরিচয় নিহিত থাকে তার অন্তরে ।

আবদুল্লা নামে আরেকজন মাইজভাণ্ডারী গান রচয়িতা কবির নাম পাওয়া যায় । তার প্রকৃত নাম ছিল শাহ আবদুর রহমান । তিনি প্রথম জীবনে ঐশ্বর্য-বিলাসিতার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেন । কিন্তু পরে হঠাৎ করেই তার জীবনের প্রতি বৈরাগ্য জন্মে । তিনি চট্টগ্রামের মাইজ-

ভাণ্ডারী পীরের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তার কবিতা লেখার হাত ছিল। পরে বড় হয়ে প্রচুর পরিমাণে গান লিখতে থাকেন। ঐ সব গান তিনি একতারা বাজিয়ে গাইতেন। মাইজ ভাণ্ডারের উৎসবে তার গানের খুব কদর হয়। তিনি 'রত্ন ভাণ্ডার', 'প্রেমভাণ্ডার' প্রভৃতি নামে কয়েক খানা গানের বই ছাপিয়েছেন। বাউলরা তাঁর গান খুব ভক্তি সহকারে গেয়ে থাকে। তাঁর একটি গানে মুর্শিদ ভজনার জন্য বার বার মনকে ব্যাকুল তাগিদ দিতে দেখা যাচ্ছে—

জাগো জাগো আরে মনো তুমি জপ আল্লাহ রসুল।
আঁখি রইল ঘুমের ঘোরে আমার মন হইল বেভুল।
—আরে মন তুমি।
জাগবার কাল জাগলায় না মন হৈলায় মস্ত হস্তী
এ ভাব স্মরণ করি ঘটাইলায় দুর্গতিরে।
সুন্দর কামিনী পাইয়া মন রে আর কয়দিন রহিবে।
সমনজারী গিরি সদারে মাল ক্রোক আসিবে রে।
—মন তুমি।
সয়ালের দয়াল তুমি রসুল আল্লার
দরুদ সালাম ভেজ নবী চরণে তোমার রে।
—মন তুমি।
নাওএর নাই ওল্লীরে দরিয়ায় নাইরে মোড়
কি বাণিজো আইল্যাম ভাই সঙ্গে লইয়া চুর রে।
—মন তুমি।
পাপে পুণ্যে ভরা দিয়া ভরা কইল্যাম ভারী
আপনে ডুবাইয়া নৌকা দোষ দেও কাণ্ডারীর রে।
—মন তুমি।
ভজবে মুর্শিদের পদে বাকি নাইরে আর।
ফকির রহমানের ঘুম ছুটলো না একবার রে।
—মন তুমি।

কবি এখানে বার বার মনকে আল্লা রসুলের জিকির করতে বলছেন। জাগতিক সুখ ভোগে মগ্ন থেকে সময় বৃথা বয়ে যায়। অথচ ধর্মের কাজ কিছুই করা হলো না। নিজকৃত পাপেই সম্মুখে চলার পথ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে এনে আল্লাকে দোষারোপ করা অনুচিত। সময় থাকতেই অজ্ঞানতার অন্ধকার কাটিয়ে সচেতন হতে হবে। মুর্শিদের শরণাপন্ন হয়ে আল্লার পথ ধরতে হবে। মাইজ ভাণ্ডারী সাধনতত্ত্বমূলক আরেকটি গান নিম্নরূপ ঃ

মনপাখি উড়াইলে বাবা
কোন নাম জপ বলো না।
তিনজনা এক যোগে গেলে
হবে না তোর ভাবনা।
দুইজনা এক যোগে গেলে
মক্কার ঘরের ঠিকানা।
কি কল্লেরই বাকসো দিলে
আজব রঙের কারখানা।
তিন হাতে এক চুড়াসী
সহজে তো মিলে না॥

কবি এখানে সাধন-পথের জটিলতা রূপকের সাহায্যে বর্ণনা করেছেন। এসব গানের ভাবসম্পদ উঁচু দরের। এগুলি বাদ্যযন্ত্র সহকারে নৃত্যের সঙ্গে গাওয়া হয়ে থাকে। এই ফকিরী গানগুলিই মাইজভাণ্ডারী গান বা হালকার গান নামে পরিচিত। গানের তাল ও রাগ রাগিণী শুনেই এসব গানকে আলাদাভাবে চেনা যায়।

সম্প্রতি "ফকিরী সঙ্গীত" নামে আরেকখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাওয়া গেছে। রচয়িতা মোঃ আতাউর রহমান। এই কবি লালন শাহের ভক্ত শাহ কলিমুদ্দিনের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসেছিলেন। তার মুখে লালন শাহ, সিরাজ সাঁই প্রমুখের গান শুনেই তিনি ফকিরী ও দেহতত্ত্বমূলক গান লেখার প্রেরণা অনুভব করেন। তিনি প্রায় তিনশত গান রচনা করেছেন। এগুলি সব ছাপার অক্ষরে বের হলে আমাদের মরমী সাহিত্য সমৃদ্ধ হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কবির একটি গান নিম্নরূপ ঃ

কার পিরীতে মজলি রে মন ভবের বাজারে
হাদীস কোরান না দেখে মন
রইলি আঁধারে।
কয়েক কবুল আল্লা রসুল ছেড়ে মরীচিকা

করিস নে ভুল পাবি রে কুল দেবেন প্রভু দেখা
তাঁর দয়ার জোরে যাবি তরে ভব সায়রে
রোজ হাশরে।
'লিল্লাহু' মাঝে 'লাহু' বিরাজে আলিফ লাম বাদ
যে আত্মা আছে দেহ মাঝে 'হু' রয়েছেন তাত
আগে দেহতত্ত্ব করে আয়ত্ত
তত্ত্ব যে নাড়ি ধরে —শিগগির করে।
(কেন) দেহ যায় গোরস্তানে শ্মশানে ছাই
আত্মা রয় অমর।
আতাউর কয় দীনমূর্খ ভাই
জানে না তার গুমর।
ওরে ভবের খাঁচা আত্মাকে বাঁচা
প্রবৃত্তিকে রেখে ধরে
খেয়াল করে।

কবি এখানে দেহতত্ত্ব বর্ণনাচ্ছলে পরমতত্ত্ব ব্যক্ত করেছেন। পরম তত্ত্ব বুঝতে হলে আগে দেহতত্ত্ব জানতে হবে। কেন এই মাটির দেহ মাটিতে মিশে যায় কিম্বা শ্মশানে ভস্ম হয় আর দেহস্থিত আত্মা অমর থাকে, তার কারণও কবি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন আত্মার 'হু' বা পরমাত্মা বিরাজ করেন বলেই আত্মা অমর। বাউলতত্ত্ব সম্বন্ধে কবি খুব ভাল জ্ঞান রাখেন তার প্রমাণ এই গানটিই।

এ পর্যন্ত যাদের কথা আলোচনা করা হোল, এঁরা ছাড়াও আরো বহু বাউল সাধক কবি রয়েছে যাদের রচনা চিরকাল মানুষের মনে চিন্তার খোরাক জুটিয়ে যাবে। এরা সবাই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু। সাধনার পথে এরা যে বহুদূর অগ্রসর হতে পেরেছিলেন সেটা তাদের রচনার অন্তরঙ্গ পরিচয় থেকেই জানা যায়। কুঠির শাহ্, যাদুবিন্দু, কালাচাঁদ পাগল, অনন্ত গোঁসাই, গোপাল, ইদু বিশ্বাস, ফকির আলীমুদ্দিন, জহিরুদ্দিন, আহসান ফকির প্রমুখ অসংখ্য ফকির বাউল রয়েছে বাংলাদেশের বুকে। তাঁরা হয়তো বেঁচে নাই কিন্তু তাদের ভাবসমৃদ্ধ গানগুলি দুঃখ-দৈন্য ও হতাশাপীড়িত মানুষের মনে অপার শান্তি এনে দেয়। ক্ষণস্থায়ী জীবনের বঞ্চনায় ভেঙ্গে না পড়ে বরং অনন্ত পারলৌকিক জীবনের জন্য ভাবতে শিখায়। কবি গোপালের একটি

গানে দেখা যায়, ধর্মচর্চা করে তাতে অন্তরের জ্বালা প্রশমিত করতে পারে এজন্য মুর্শিদের দয়া ভিক্ষা করা হয়েছে ঃ

মুর্শিদ তোমা বিনে ত্রিভুবনে কে আছে আমার
মনের আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ, কে নিভাবে আর ?
কোথায় ছিলাম কোথায় এলাম
যাব কোথায় না জানিলাম
গায়েব দেখে ধান্ধা হলাম, কি করলাম এবার।
বহুত দুঃখেতে ফেলে
মানুষ কুলে জন্ম দিলে
গায়েব করবে বাক্য বলে দয়া নাই তোমার।
আগে হুশ না দিলে তুমি
শেষে কি করিব আমি
হয়ে আছি নরকগামী দোজখ মাঝার !
গোপাল যেটা বাঞ্ছা করে
পুরা কর পরওয়ারে
করিব দীন ইসলাম জারি হুকুমে তোমার ।।

অধ্যাপক আবদুল হামিদ রচিত 'চলন বিলের ইতিকথা' থেকে জানা যায় চলন বিল অঞ্চলে বহু ফকির বাউল ছিল। এখনও আছে। এই অঞ্চলের নিরক্ষর বাউল খোন্দকার আহসান আলী একজন বিখ্যাত বাউল কবি। তিনি প্রায় ৪০.৪৫ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন। তিনি অনেকগুলি মারফতী গান রচনা করেছিলেন। সেগুলি তার পুত্র বাউল আশরাফ আলী খোন্দকার ও শিষ্য ফকির আছরফ ক্ষেপার মুখে মুখে এখনো বেঁচে আছে। এরাও মারফতী গান লিখে থাকে। কবি আহসান আলী বাউলের দু'খানি মারফতী গান নিম্নরূপ ঃ

(১)

ফানাফিল্লার হাটে যাওয়া সহজ নয়
কেউ হাটে যায়্যা চুবান খায়্যা দৌড়াইয়া পালায়।
যে যাবে ফানাফিল্লাহ,
সে হবে চেল্লা বেল্লা
তারে সাঁই মাবুদ আল্লাহ ভালবেসে দিদার দেয়।

যেখানেতে ফানাফিল্লাহ,
সেইখানেতে বাকাবিল্লাহ,
সেইখানেতে নূর তাজেল্লা বিরাজ করে সব সময়।
ফকির আহসান উল্লাহ, বলছে খাঁটি
ছাড়ান দিয়া ফাটি ফুটি
মন করিলে আসল খাঁটি
তারেই গোসাঁই দিদার দেয়॥

(২)

যেদিন রাসুলুল্লাহ, হাবিবুল্লাহ, আসমানে গেল
যেদিন রাসুলুল্লাহ, হাবিবুল্লাহ, মেরাজে গেল
নবী বোরাখেতে সওয়ার ছিল
জিবরাইল সাথে গেল
রফরফ মোকাম বিছে পৌঁছাইয়া দিল।
মাকামুম মাহমুদা বিছে,
নূরের সত্তর হাজার পর্দা আছে
সেইখানেতে দ্বীনের নবী পোঁছিয়া গেল।
যেদিন রাসুলুল্লাহ, হাবিবুল্লাহ, মেরাজে গেল।
ফকির আসান বলে দ্বীনের নবীর দিদার হইল।
যেদিন রাসুলুল্লাহ, হাবিবুল্লাহ, আসমানে গেল।

আহসানউল্লার এই গান দুইটির মধ্য দিয়ে তার ভক্ত মনের ছবিটি সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে। সুফী সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে কবির যে বেশ জ্ঞান আছে তাও বোঝা যায়। অথচ তিনি ছিলেন নিরক্ষর।

পাবনা জেলার ভাবুক কবি আলীমুদ্দিন ফকিরের সঙ্গে কবি পাগলা কানাইর গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। ইদু বিশ্বাস ছিলেন পাগলা কানাইর শিষ্য। কিন্তু পরে তিনি পাগলা কানাইর সঙ্গে রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামেন। ফকির আলীমুদ্দিন ইদু বিশ্বাস এঁরাও অনেক গান রচনা করেছেন, যেগুলি আধ্যাত্মিক রস-পিপাসু মনের কাছে ছিল সম্পদ স্বরূপ। গ্রামের নিরক্ষর জনসাধারণ এসব মারফতী ও মুর্শিদী গানের আসরে এক নৈর্বক্তিক আনন্দের সন্ধান পেত। সিলেটের মওলানা ইব্রাহীম আলী তশনা একজন সুফী দরবেশ ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্ম বিষয়ক গভীর

জ্ঞান আহরণের পর দীর্ঘ নয় বছর সাধনা করেন। তিনি বিভিন্ন পণ্ডিতের নিকট থেকে হাদীস ও মারেফত শিক্ষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এমন কি আধ্যাত্মিক বিষয়েও শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তিনি তশ্‌না শাহ্‌ নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। তশ্‌না শাহ ছিলেন মরমী কবি। তিনি প্রায় তিন শতাধিক মারফতী গান রচনা করেন। গভীর ভাবসমৃদ্ধ এই গানগুলি তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার গভীরতার পরিচয় বহন করে। তাঁর একটি গান নিম্নরূপ ঃ

শুন শুন গুল বদনী
মন রতনের চন্দ্র মণি
আর আমারে যন্ত্রণা দিয়া
কৈর না রে পেরেশান।
উদাসী তশ্‌নায় বলে
আছিলাম সুখে নদীর কুলে
দেখিয়া কালিয়ার রূপ
গেল আমার দিল ও জান ॥
বারে বারে উঠে দিলে আগুনিয়া জ্বালা গো
কোথায় মধু মালা ?
প্রেমের সাগরে উঠে আগুনি ঢেউ
পানিতে আগুনি জ্বলে মহব্বতের লীলা।
প্রেমের অনল হইল দর্শনে দ্বিগুণ
পানি দিলে অগ্নি জ্বলে, একি হইল জ্বালা ॥

কবি আল্লাকে অন্তরে পান না বলেই এমন কাতরতা প্রকাশ করেছেন। কবি নিদ্রায় স্বপনে তাঁকে পান কিন্তু জাগরণে হারিয়ে ফেলেন। এই হারানোর যাতনায় অহর্নিশ জ্বলে মরছেন। কবি প্রেমিক। আল্লা প্রেমাস্পদ। প্রেমাস্পদকে তিনি 'গুলবদনী', চন্দ্রমণি, 'গুলিস্তান প্রভৃতি সম্বোধনে ভূষিত করেছেন। নিম্নলিখিত গানটিতে আল্লার প্রতি ভালবাসা ও তাঁকে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা অপরূপ রস-সমৃদ্ধি লাভ করেছে।

ও গুলের গুলিস্তান
আমাকে মারিলায় নয়নবাণ ॥
তুমি থাক ফুল বাগানে

আমি থাকি বনে বনে ;
শান্তি হয় কিরূপে মনে ?
বল ওহে জ্ঞানের জান ।
যথায় তথায় থাকি আমি,
হৃদয়ে গাঁথা আছ তুমি
শুইলে স্বপনে দেখি
জাগিয়া না পাই নিশান ।।
ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরি
চন্দ্রমণি নাহি হেরি,
কেবল ও হৃদয়ে আছে
গুলবদনীর রূপ ধেয়ান ।।
তুমি আছ শীতল চিতে
আমার হৃদয়ে অগ্নি জ্বলে,
জ্বলিয়া হইল ছাই
প্রেমানলে দিল ও জান ।।

শোনা যায় এই সুফী কবি ঐকান্তিক সাধনার বলে আল্লার নৈকট্য লাভ করেছিলেন। ফলে তিনি অনেক অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন।

৬

বাংলাদেশে কত কবি আধ্যাত্মিক জীবনে সমাহিত হয়ে পরম মুক্তির অনুসন্ধান করেছে। তারা রচনা করেছে কত তত্ত্বসমৃদ্ধ গান, কবিতা। তাদের সকলের খোঁজ হয়তো আমরা জানি না। তাদের কেউ হয়তো সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিল ; কেউ বা সংসারের প্রতি অনীহাবশতঃ পথের টানে বেরিয়ে গিয়েছিল কিন্তু সাফল্যের চরম মুহূর্ত আসার আগেই ঢলে পড়েছিল মৃত্যুর কোলে। তাদের কথা সাহিত্যের ইতিহাসে নেই—তাদের রচনাও সাহিত্যের ছাপাখানায় প্রবেশাধিকার পায় নাই। কিন্তু মুখে মুখে তাদের গান প্রচলিত আছে জনসমাজে — হয়তো কোন পাগলা বাউলের কণ্ঠে, ফকিরের ভিক্ষা মাঙ্গার গানে অথবা মারফতী বা মুর্শিদীর আসরে। কেউ বা একেবারেই হারিয়ে গেছে — নাম নিশানাহীন ! যাদের পরিচয়

বা সাধনার ফসল আমরা পেয়েছি তারা আমাদের শ্রদ্ধেয় সন্দেহ নেই কিন্তু যারা হারিয়ে গেছে তাদের অজ্ঞাত দানের যে কোনই মূল্য নেই একথা ভাবা একেবারেই বোকামি। কারণ যা হারিয়ে যায় তা একেবারেই যায় না। পেছনে একটা অদৃশ্য প্রভাব রেখে যায় বৈকি। প্রত্যেক ঘটনারই থাকে একটা ধারাবাহিকতা। যখন সে সব অজ্ঞাত কবিরা গান রচনা করেছেন তখন নিশ্চয়ই তাদের শিষ্য-সাগরেদ বা ভক্তজনও ছিল। তারা হারিয়ে গেছে কিন্তু তাদের ভক্ত অনুচর ও শিষ্যদের কণ্ঠে রেখে গেছে তাদের গান—কিম্বা তাদের প্রভাবের ফলেই পরবর্তীকালে গড়ে উঠেছে আরো অনেক মরমী কবি বা বাউল ফকির সম্প্রদায়, যাদের অমূল্য রচনা পেয়ে আমাদের মরমী সাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করেছে। কাজেই কেউই আমাদের কাছে ফেল্না নয় — অবহেলার নয়, হোক সে স্বনামধন্য অথবা নগণ্য — সাধারণ জনগণের একজন। যাদের পেয়েছি তারাও যেমন শ্রদ্ধার্ঘ পাওয়ার যোগ্য, যাদের পাইনি কিন্তু পেতে পারতাম তারাও তেমনি শ্রদ্ধার্ঘ পাওয়ার যোগ্য। বস্তুতঃ মরমী সাহিত্যের উৎপত্তিই তো অদৃশ্য বস্তু বা শক্তির অনুসন্ধিৎসা থেকে। সুতরাং যারা প্রেম-দেওয়ানা হয়ে অলৌকিক প্রেমের অঞ্জন নয়নে মেখে জগতবাসীকে প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষা দেবার ব্রত নিয়েছে, মানুষে মানুষে বিভেদের প্রাচীর তুলে দিয়ে এক প্রাণ, একদেহ হয়ে সেই অনন্ত শক্তিময়ের আরাধনায় জীবন উৎসর্গ কয়ার প্রেরণা দিয়েছে, কিম্বা 'অধর মানিক' বা 'মন মানুষের' খোঁজে হারিয়ে গেছে কোন অজানায়, তাদের ধ্যান ধারণা তাদের জীবনবোধ, বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সামগ্রী। এই অমূল্য সামগ্রীর পুষ্পতুল্য নির্যাস যদি আমাদের সমাজদেহের সকল ক্ষত, সকল পূতিগন্ধ দূর করে এক অমল সৌরভ ছড়িয়ে দিতে পারতো তবেই হোত মরমী সাধকদের জীবন-সাধনার যথার্থ মূল্যায়ন। এর জন্য প্রয়োজন ব্যাপক চর্চা। আমাদের মরমী সাহিত্যসমূহের বিস্তৃত পঠন পাঠন বাংলাদেশের নৈতিক চরিত্রের উন্নয়নে যে যথেষ্ট শক্তি রাখে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যারা মরমী সাহিত্য রচনা করেছেন তারা সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে ক্ষুদ্র ভেদবুদ্ধি বা জাগতিক কলুষতা মুক্ত। সুতরাং সেই সব মহৎ প্রাণের অমিয় ধারায় নিষিক্ত হলে হয়তো আমরাও অকল্যাণকে প্রতিরোধ করতে পারি। জীবন হতে পারে সার্থক ও সুন্দর।

॥ ৭ ॥

মরমী কবি রবীন্দ্রনাথ

আধুনিক কালে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আধ্যাত্মিক ভাবনা-চিন্তাও আমাদের মরমী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর যে কাব্য নোবেল পুরস্কারের গৌরব অর্জন করেছে, সেখানকার মূল সুর আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। যে কবি যত বেশী জীবনবাদী, পৃথিবীর প্রতি ভালবাসা যার প্রবল, মরমী দৃষ্টিভঙ্গী তাঁরই তত গভীর হয়। জীবনের প্রতি ভালবাসা রবীন্দ্রনাথে যে কত গভীর ও ব্যাপক—তা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বিভিন্ন কবিতায়—গানে। এই পৃথিবীর তুচ্ছতম বস্তুও কবির কাছে প্রিয়। প্রতিটি বস্তুকেই গভীর মমতায় আঁকড়ে ধরে থাকতে চান চিরকাল। কিন্তু কেহই শেষ পর্যন্ত তাঁকে বেঁধে রাখতে পারে না। এক মহাশক্তিধরের নির্দেশে চলে যেতে হয় কোন অচেনা লোকে।

জগৎ ও জীবনের পানে তাকিয়ে কবির চোখে উদঘাটিত হয় এক মর্মবিদারী দৃশ্য ঃ একদিকে ধরে রাখার আকুল প্রয়াস, অন্যদিকে প্রবল শক্তিতে ছিনিয়ে নেওয়া। কবি উপলব্ধি করেন—

"এই বিশ্ব চরাচরে স্বর্গমর্ত ছেয়ে
সব চেয়ে পুরাতন সুর, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন — "যেতে নাহি দিব।"
তবু যেতে দিতে হয়।"

এই যে যেতে দেওয়া — এযে কি মর্মান্তিক তা জীবনবাদী কবি জীবনের সব অণুপরমাণু দিয়ে অনুভব করেছেন। পৃথিবীর স্বর্গ খণ্ডগুলির সৌন্দর্য ও প্রেমে বিমুগ্ধ কবির চিৎকার করে আকাশ পাতাল মথিত করে বলতে ইচ্ছা হয় — "যেতে নাহি চাই।" কিন্তু যাওয়াটাই অমোঘ সত্য—কঠিন

নিয়ম। অদৃশ্যলোকে বিরাজমান মহাশক্তিধর বাঁশিতে যখন সংকেত দেন, তখন আর সাধ্য নেই বিলম্ব করার। কিন্তু পেছনের বাঁধন ছিঁড়তে একটু সময় লাগে বৈকি! তাই কবি বার বার ক্ষমা চেয়ে নেন :

ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু
পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু
এই যে হিয়া থরো থরো কাঁপে আজি এমন তরো
এই বেদনা ক্ষমা করো, ক্ষমা করো প্রভু ॥
এই দীনতা ক্ষমা করো প্রভু
পিছন পানে তাকাই যদি কভু ॥

তারপরে বলেছেন—

আগুনের পরশ মণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন পুণ্য করো দহন দানে
আমার এই দেহখানি তুলে ধরো
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো
নিশিদিন আলোক শিখা জ্বলুক গানে।
আগুনের পরশ মণি ছোঁয়াও প্রাণে
আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারারাত ফোটাক তারা নব নব
নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো
যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো
ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্ধ্বপানে।
আগুনের পরশ মণি ছোঁয়াও প্রাণে।

পরশমণির পরশে কবি হৃদয়কে পূত পবিত্র করতে চেয়েছেন। আত্মার মলিনতা অপসারিত করতে চেয়েছেন। তা নইলে যে পরমাত্মা বা জীবন-দেবতার প্রতিষ্ঠা সেখানে ঘটবে না। চর্যাকারদের পরমানন্দ, বৈষ্ণবদের পরমাত্মা, বাউলের মনের মানুষ আর রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার একই রূপ। এই জীবন-দেবতাকে পাওয়াই কবির জীবন-সাধনা। তাঁকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করেন না বলেই আকুল আর্তি তোলেন—

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে
আমার সুরগুলি পায় চরণ
আমি পাই না তোমারে।

বাতাস বহে মরি মরি, আর বেঁধে রেখ না তরী।
এসো এসো পার হয়ে মোর হৃদয় মাঝারে।।
তোমার সাথে গানের খেলা দূরের খেলা যে
বেদনাতে বাঁশী বাজায় সকল বেলা যে।
কবে নিয়ে আমার বাঁশী বাজাবে গো আপনি আসি
আনন্দময় নীরব রাতের নিবিড় আধারে।।

বাউলেরা অশিক্ষিত। একতারা বাজিয়ে গান গেয়ে পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছে মনের মানুষের সন্ধানে। তাদের রচনায় ভাবের ব্যাপক সমৃদ্ধি থাকলেও ভাষার দিক দিয়ে ছিল দুর্বল। এটাই স্বাভাবিক — কারণ শিক্ষার স্বল্পতাহেতু ভাষাজ্ঞান তাদের হয়নি। আর রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানে গরিমায় বিশ্ববরেণ্য কবি। ভাষার অনুপম কারুকার্যে, নিটোল ছন্দ লালিত্যে কবিতার নৈবেদ্য সাজিয়ে জীবন-দেবতার অন্বেষণ করেছেন। জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্যের মাঝে কবির হৃদয় যে অবগাহন করেছে তার কারণই হচ্ছে সেই সৌন্দর্যময়কে ধরা। তাই তিনি বলেন—

রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন
আশা করি।
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর ভাসিয়ে আমার
জীর্ণ তরী।

সময় যেন হয় রে এবার
ঢেউ খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে
অমর হয়ে রব মরি।।

শেষে কবি বুঝতে পারেন — অসীম লীলাময়ের সকল লীলা-খেলা এই সসীমের মাঝেই। মানুষের হৃদয়ের প্রেম ভালবাসা, সৌন্দর্য-চেতনা ইত্যাদির মাঝে সেই অসীমই ক্ষণে ক্ষণে এসে ধরা দেন। সেই অরূপ ও কবির মাঝে যখন মিলন ঘটে, অরূপ যখন কবির হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হন তখনই সারা বিশ্বই কবির চোখে সৌন্দর্যময় হয়ে ওঠে — মঙ্গলময়ের স্পর্শে তার সুখ দুঃখগুলিও অপরূপ রূপ লাভ করে। কবি তখন গেয়ে ওঠেন—

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে, কত গানে কত ছন্দে
অরূপ, তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর ।।
তোমায় আমায় মিলন হলে সকলই যায় খুলে
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে।
তোমার আলোয় নাই তো ছায়া
আমার মাঝে পায় সে কায়া
হয় সে আমার অশ্রুজলে সুন্দর বিধুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর ।।

কেবল গীতাঞ্জলী নয়--গীতালী, গীতিমাল্য কাব্য দুখানিও কবির অধ্যাত্ম সাধনার পরিচয় বহন করে। গীতাঞ্জলীতে দেখা যায় কবি নানাভাবে সেই অরূপের অন্বেষণ করেছেন--তাঁকে হৃদয়ে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ফিরেছেন। মনের মানুষকে না পেয়ে বাউলের যে ব্যাকুলতা ও বেদনা, অরূপ বা জীবনদেবতাকে না পেয়ে রবীন্দ্রনাথের ব্যাকুলতা ও বেদনাও সেই রূপই -- তেমনি মর্মস্পর্শী। কবি সহজে পান না বলে যে হতাশ হয়ে পড়েন তা নয়। তিনি হাল ছেড়ে দিতে রাজী নন। সাধন-পথের বেদনাকে বুক পেতে গ্রহণ করতে চান। কারণ এই বেদনাও এক রকম আনন্দ। তাই গীতিমাল্যে কবি বলছেন--

আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ।
খেলে যায় রৌদ্র ছায়া, বর্ষা আসে বসন্ত। .....
সারা দিন আঁখি মেলে দুয়ারে রব একা
শুভখন হঠাৎ এলে তখনি পাব দেখা ।।

সেই শুভক্ষণ — যে শুভক্ষণে প্রেমাস্পদ এসে প্রেমিকের কাছে ধরা দেবে — হবে বিরহের অবসান। এই শুভক্ষণের শুভলগ্নের প্রতীক্ষায় কবির অবিরাম পথ চলা।

॥ ৮ ॥

মরমী সাহিত্য ঃ সীমাহীন বিরহের গান

মরমী সাহিত্যের মধ্যে সেই প্রাচীন কালের চর্যাপদ থেকে এ পর্যন্ত যত কিছু রচিত হয়েছে, সবের মধ্যেই এক প্রকার ঘনীভূত বেদনার সুর অনুরণিত হয়েছে। কি সে বেদনা? এ বেদনার ব্যাখ্যা নেই, রয়েছে কেবল সর্বগ্রাসী আবেদন, যা জন থেকে জনে--মন থেকে মনে সহজেই সংক্রমিত হয়ে যায়। এই মধুর মানব জীবনের অনিত্যতা, মায়াময় বিশ্বসংসারের প্রতিটি বস্তুর অসারতা, ক্ষণিকের প্রতি এমন প্রবল আকর্ষণ ও শেষে নৈরাশ্য কবিদের ভাবনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। সহসা সচকিত হয়ে তাঁরা অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়েছেন সুদূর অদৃশ্যলোকের পানে — যেখানে এক পরম পুরুষ গভীর কৌতুকে সকল কিছু অবলোকন করছেন; হাসছেন মৃদু মৃদু রহস্যময়তার ধূম্রজাল সৃষ্টি করে। মরমী কবিদের সকল জিজ্ঞাসা, সকল সাধনা এই পরম পুরুষের সন্ধানেই সদা প্রবাহিত। মুখোমুখি দাঁড়ানো নয়—একেবারে মিশে যেতে চান সেই পরম সত্তার মধ্যে। কিন্তু কই, পান নাতো! আর পান না বলেই এক অব্যক্ত ক্রন্দনে আকাশ বাতাস পূর্ণ করে তুলেছেন। ''আমি কোথায় পাবো তারে—আমার মনের মানুষ যে রে'' বলে এই যে আকুল আর্তি এ কেবল শাহজাদপুরের গগন বাউলের নয়—এই আর্তি সকল যুগের সকল মরমী কবিরই অন্তর নিঃসৃত।

এ জন্যই মরমী সাহিত্যকে এক সীমাহীন বিরহের গান—বেদনার মর্মধ্বনি বললেও অত্যুক্তি হয় না।

॥ ৯ ॥

শেষ কথা

এ পর্যন্ত যা আলোচনা করা হোল এই প্রসঙ্গে একটি কথা পরিষ্কার করে রাখা ভাল। 'বাংলাদেশের মরমী সাহিত্য' বলতে কোন্‌টা বোঝায়-- সেকি বাংলা ভাষায় রচিত সকল মরমী সাহিত্য, না কি বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে থেকে কিম্বা জন্ম নিয়ে যে সব কবি-সাহিত্যিক সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন সেগুলোকে বোঝায়? যদি বাংলা ভাষায় রচিত মরমী সাহিত্যকে বোঝান হয় তবে কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রেই প্রশ্নটা সোচ্চার হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আমি বলবো -- সাহিত্যকে কখনো ভৌগোলিক গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা যায় না। এ হচ্ছে প্রবহমান নদীর মত। নদী যেখান দিয়ে প্রবাহিত হয় সেই স্থানকেই প্লাবিত করে, পলি ফেলে, উর্বর করে। যে স্থান দিয়ে প্রবাহিত হয়, সেই স্থানের জনগণই বলে এটা আমাদের নদী। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই কথাই চলে। যে-কোন বাঙ্গালী কবি -- তিনি যেখানেই জন্ম গ্রহণ করুন আর সাহিত্য চর্চা করুন, যদি তা বাংলা ভাষায় হয় এবং আমরা তার দ্বারা উপকৃত হই তবে তা আমাদের এই বাংলাদেশেরই সাহিত্য। এই গ্রন্থে হয়তো এমন কোন কোন কবির নাম করা হয়েছে -- যারা এই বাংলার নন। কিন্তু তারাও আমাদের কবি, তাদের রচনাও আমাদের সাহিত্য -- ঠিক সেই অর্থে, যে অর্থে রবীন্দ্রনাথ আমাদের কবি, তাঁর রচিত সাহিত্য সমগ্র বাংলা ভাষাভাষীর সাহিত্য! জয়দেব তো সংস্কৃত ভাষায় পদাবলী রচনা করেছেন -- বিদ্যাপতি মৈথিলী ভাষায়। কিন্তু তাঁরা কি করে হলেন বাংলা পদাবলী সাহিত্যের আদি কবি? আসল কথা হচ্ছে—আমরা জানি কোন কোন ধর্ম ও ধর্মনির্ভর সাহিত্য যেমন ব্যাপক প্রভাবের দ্বারা জাতীয় চিত্তকে গ্রাস করে

ফেলে এবং তা জাতীয় সংস্কৃতির উৎস হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি কোন কোন কবিরও সেই রকম শক্তি থাকে যাঁদের রচনা সৌকর্যের প্রভাবে বাংলা ভাষাভাষী রসপিপাসু সকলেই প্রভাবান্বিত হন। এঁদের দেশ-কালের দ্বারা খণ্ডিত করা যায় না। এঁরা সার্বজনীন। কবি চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি বা বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যরা এই অর্থেই আমাদের কবি -- আমাদের এই বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে জন্ম না নিয়েও আমাদের কবি। কারণ আমরা পেয়েছি তাঁদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। সেই বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের মনোভূমি হতে উৎসারিত সাহিত্য নদীটি নানা শাখা উপশাখায় বিভক্ত হয়ে সমগ্র বাংলার সমভূমিকে রসসিঞ্চিত করে বয়ে গেছে সার্থকতার উদ্দেশে। তাই বাংলা ভাষায় রচিত সকল মরমী সৃষ্টিই আমাদের বাংলাদেশের 'মরমী সাহিত্য।''